মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৫, সংখ্যা-০২
মার্চ ২০১৬ ইং, জুমাদাস সানী ১৪৩৭ হি., ফাল্গুন ১৪২২ বাং

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية
جمادى الثانى ١٤٣٧ﻫ مارس ٢٠١٦م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৫..... ৪
দরসে ফিকহ
পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৫......... ৭
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১০
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
হারানো প্রশান্তির সন্ধানে...................... ১১
“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :
বিভিন্ন গোমরাহ দল : উলামায়ে কেরামের করণীয়....... ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
তাসবীহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি : একটি দালিলিক বিশ্লেষণ....... ১৯
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৫....... ২৩
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
ইকবালের কবিতায় নারী ২২
মাওলানা কাসেম শরীফ
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩১

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে
ইলমে ফিকহ চর্চার পথিকৃৎ এক মুজাদ্দিদ............. ৩৩
মুফতী শরীফুল আজম
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবস্থান অনুসরণীয় ৪৩

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

দ্বীনি মাদরাসায় হামলা জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে

মসজিদ-মাদরাসা ইসলাম ধর্মের শি'আর বা প্রতীক। মুসলমানদের ইবাদতখানা। মসজিদ যেমন নামায আদায়ের স্থান, তেমনি মাদরাসা কোরআন তিলাওয়াতের স্থান, হাদীসে রাসূল (সা.) পঠন-পাঠনের স্থান। ইসলামী অনুশাসনে কোরআন তিলাওয়াত, হাদীসের পঠন-পাঠন, দ্বীনি শিক্ষা অর্জন, দ্বীনি তারবিয়াত দান ইত্যাদি সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

আরো ব্যাপক করে বলা যায়, একজন মুমিন মুসলমানের নিয়্যাত যদি ঠিক থাকে তার প্রতিটি আমল, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ, খানাপিনা, প্রতিটি দুনিয়াবি কাজ, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য–সবই ইবাদত। তাই কোনো মুসলমানের ওপর আঘাত তো দূরের কথা, কথা-বার্তায়ও আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত পন্থা ব্যতিরেকে কোনোভাবে আঘাত করা ও খোঁচা মেরে কথা বলা নিষেধ।

যেখানে ইসলামী শরীয়ত একজন মুসলমানের বেলায় এই নির্দেশনা দিয়ে থাকে, সেখানে মসজিদ-মাদরাসার মতো সর্বোচ্চ পবিত্র স্থানে হামলা ও ভাংচুর করা কতটা জঘন্য তা কল্পনাতীত। ইসলামী শরীয়ত এর জন্য রেখেছে কঠোর শাস্তির বিধান। সুতরাং মসজিদ-মাদরাসার ওপর হামলা, আঘাত কোনো দেশ ও জাতির জন্য শুভবার্তা নয়।

উপমহাদেশে দীর্ঘকালের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটার আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব কারণ ছিল ইসলামী শি'আরের ওপর তারা আঘাত হেনেছিল। মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছিল। ইসলামকে পরাভূত করার হাজারো চেষ্টায় রত ছিল। উলামায়ে কেরামের রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছিল। ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর এমন আঘাত তারা হেনেছিল, যার হৃদয়বিদারক ইতিহাস এখনো মুসলমানদের অন্তরকে জর্জরিত করে, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও মেহেরবানি, মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের অসংখ্য ত্যাগ-তিতিক্ষায় উপমহাদেশ এই জালিম শাহির কবল থেকে মুক্ত হলো। মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসস্থল অস্তিত্ব লাভ করল। সে পথ ধরে আরো অসংখ্য রক্তঝরা ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কিছুকালের ব্যবধানে আজ নতুন করে শুনতে হচ্ছে, এ দেশে মসজিদ-মাদরাসায় হামলার ঘটনা। শুনতে হচ্ছে উলামায়ে কেরামের ওপর হামলার ঘটনা। শুনতে হচ্ছে মাদরাসার হামলার কারণে হাফেজে কোরআনের শাহাদাতের ঘটনা। মেহমানে রাসূল (সা.) তালেবের ইলমদের আহত হওয়ার ঘটনা।

এসব পুরো দেশ, জাতি এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য অশুভ বার্তা বৈ কিছু নয়। এসব আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিরও নমুনা। আল্লাহর গজব নেমে এলে কি সরকার, কি জনগণ, কি মুসলিম, কি অমুসলিম, কি আলেম, কি সাধারণ–একচেটিয়া সকলকে এর খেসারত দিতে হবে।

এরূপ সর্বনাশা-অশুভ কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করে গোনাহ মাফ চাওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে কান্নাকাটি করে দু'আ করা আবশ্যক।

বৈশ্বিক কিছু দায়দায়িত্ব আছে, যেগুলো পালনে আমাদের যত্নবান হতে হবে। সরকার এবং প্রশাসনের এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এসব স্বয়ং সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কি না, তাও সরকার খতিয়ে দেখতে পারে। সরকার এবং প্রশাসনকে বুঝতে হবে ষড়যন্ত্র যার বিরুদ্ধে যেই করুক এর ক্ষতি ও খেসারত এক ব্যক্তি বা এক গোষ্ঠীকে ঘিরেই নয়, বরং পুরো দেশ-জাতির জন্য ক্ষতির আশঙ্কা। তাই এ পর্যন্ত যা ঘটে গেছে তাতে প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আগামীর ব্যাপারেও প্রশাসনকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

উলামায়ে কেরাম ও তালাবায়ে এজামকেও সচেতন হতে হবে। মসজিদ-মাদরাসাকে চলতে দিতে হবে আপন গতিতে। মনে রাখতে হবে, সকল মুসলমানেরই হক্ব রয়েছে মসজিদ-মাদরাসায়। এগুলোকে প্রচলিত নোংরা রাজনীতি ও দলাদলির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ তথা হযরত আল্লামা কাসেম নানুতবী, রশীদ আহমদী গঙ্গুহী, হোসাইন আহমদ মাদানী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহিমাহুমুল্লাহু আলাইহিম)-এর আদর্শ ও নীতিমালাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। কারণ এসব মাদরাসার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা তার ওপর ভিত্তি করেই। মূল নীতি-আদর্শ থেকে পশ্চাৎপদ হওয়া যাবে না। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হলো দেওবন্দী মাদরাসা যত দিন তার নিজস্ব নীতি-আদর্শের ওপর ছিল এবং থাকবে দুনিয়ার কিছুই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না, পারেনি। আদর্শচ্যুত হয়ে অনেকে বিপৎগামী হয়েছে, এমন নজিরও কম নেই। তাই নিজেদের আদর্শকেই সমুন্নত রাখতে হবে।

তালাবায়ে এজামকে আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শ ও তারবিয়াত সম্পর্কে জানতে হবে, সে মতে চলতে হবে। কারণ তালেবে ইলমগণ হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মেহমান। আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা। আল্লাহ ইলমে নববীর জন্য পছন্দ করেছেন বিধায় আপনি দেওবন্দী মাদরাসার তালেবে ইলম। সুতরাং আপনার প্রতিটি কাজে নববী সুন্নাতের আলো চমকাতে থাকবে। পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে প্রভাবিত হওয়া নয়। মাদরাসায় যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং উস্তাদগণ যা তারবিয়াত দিয়ে থাকেন, তার বিমূর্ত প্রতীক হিসেবেই একজন তালেবে ইলমের জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হওয়া উচিত।

আল্লাহ সকল মসজিদ-মাদরাসাকে রক্ষা করুন, যাবতীয় হাজাত গায়েব থেকে পূর্ণ করুন, সকল তালেবে ইলম ও আসাতেযাকে কবুল করুন। আমীন

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৬/০২/২০১৬ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد

যদি কোনো কোরআন এমন হতো, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা জমিন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কী হতো? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (রা'আদ ৩১)

মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্য রাসূল হওয়ার নিদর্শনাবলি তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মু'জিযার মাধ্যমে দিবালোকের মতো ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবু জাহেল বলে দিয়েছিল যে বনু হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে স্বীকার করতে পারি যে আল্লাহর রাসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করছেন? তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোনো অবস্থাতেই তাঁকে বিশ্বাস করব না। এ জন্যই সে বিভিন্ন বাজে জিজ্ঞাসাবাদ ও অবান্তর ফরমায়েশের মাধ্যমে সর্বত্র এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াত আবু জাহেল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এ প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে।

ইমাম বগভী (রহ.) তাঁর তাফসীরে লেখেন, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হলো। তাদের মধ্যে আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল, আপনি যদি চান যে আমরা আপনাকে রাসূল বলে স্বীকার করে নিই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবি আছে, এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবি ছিল এই যে মক্কার শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন, যাতে মক্কার জমি প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে দাউদ (আ.)-এর জন্য পাহাড় সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহর কাছে দাউদের চেয়ে খাটো নন।

এরূপ তারা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ন্যায় বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে সিরিয়া ও ইয়েমেনের দূরত্ব কমানো এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় মৃতদেরকে জীবিতকরণ ইত্যাদির দাবি করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসহ আরো কয়েকটি আয়াত তাদের এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবির উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–

ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنى عليهم كل شئ قبلا ما كانو ليؤمنوا

মোট কথা হলো, তাদের এসব দাবি পূরণ করে দেওয়া হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কারণ তারা এসব দাবির পূর্বে এমন এমন মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জিযার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। রাসূল (সা.)-এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর। এমনিভাবে হাতে নিস্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তাসবীহ পাঠ করা কোনো মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চেয়ে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। শবে মিরাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের অলৌকিকতার চেয়ে অনেক মহান। কিন্তু তারা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবির পেছনেও তাদের নিয়্যাত যে টালবাহান করা–কিছু মেনে নেওয়া নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুশরিকদের এসব দাবির লক্ষ্য এটাই ছিল যে তাদের দাবি পূরণ না করা হলে তারা বলবে, (নাউজু বিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রাসূলের কথা আল্লাহ কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে তিনি আল্লাহর রাসূল নন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, بل لله الامر جميعا

অর্থাৎ ক্ষমতার সবটুকু আল্লাহ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে উল্লিখিত দাবিগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে এগুলো আল্লাহর শক্তিবহির্ভূত, বরং বাস্তব সত্য এই যে জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবি পূর্ণ করা উপযুক্ত মনে করেননি। কারণ দাবি উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়্যাত তাঁর জানা আছে। এর কু উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হিকমতানুযায়ী যা করেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা, হঠকারিতা না করা, এটিই সবার করণীয়।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১৫

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং-৩২ :

عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَالِي أَرَاكَ كَئِيبًا؟ قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لِي الْبَارِحَةَ فُلَانٍ، وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ .قَالَ :فَهَلَّا لَقَّنْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ :فَقَالَهَا؟ قَالَ :نَعَمْ .قَالَ :وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .قَالَ أَبُو بَكْرٍ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ هِيَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ :هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ، هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে বিষণ্ন অবস্থায় হাজির হলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে বিষণ্ন দেখছি, এর কী কারণ? তিনি বললেন, গত রাতে আমার চাচাতো ভাইয়ের ইন্তেকাল হয়েছে, অন্তিম সময় আমি তার পাশে বসা ছিলাম। সেই দৃশ্যের কারণে মনের ওপর প্রভাব পড়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন, তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়িয়েছিলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, সে কি এই কালেমা পড়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়েছিল। তিনি ইরশাদ ফরমালেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবিত লোকেরা যদি এই কালেমা পড়ে, তবে কি হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুবার ইরশাদ ফরমালেন, এই কালেমা তাদের গোনাহসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেবে।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/৬৬, হা. ৬৫, আত-তারীখুল কাবীর [বুখারী] ২/৩২৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩২৩, হা. ৩৯১০, তাবারানী কাবীর ১২/২৫৪, হা. ১৩০২৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

উক্ত হাদীসের সমর্থনে এই মরফু হাদীসটিও উল্লেখ করা হয়েছে।

عن علىؓ من قال إذا مر بالمقابر (السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ يا أهل لا إله إلا الله! بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا فى زمرة من قال : لا إله إلا الله) غفر الله له ذنوب خمسين سنة؛ قيل: يا رسول الله! من لم تكن له ذنوب خمسين سنة؟ قال: لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين.

(كانيول উম্মাল, দায়লামী)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

এই হাদীসের সমর্থনে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصاً صافياً ومده بالتعظيم كفر الله عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر قيل ان لم يكن له اربعة الاف ذنب قال يغفر من ذنوب اهله وجيرانه۔

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

হাদীসটি মওকূফ।

ক.

এক হাদীসে আছে, তোমরা জানাযার সাথে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকো।

عن عبد الله بن محمد بن وهب :حدثنى يحيى بن محمد بن صالح :حدثنا خالد بن مسلم القرشى :حدثنا يحيى بن أيوب

হাদীস নং-৩৩ :

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي .قَالَ: إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا .قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ :هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ

হযরত আবুজর গিফারী (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো অসিয়ত করুন। ইরশাদ হলো, যখন কোনো অন্যায় কাজ করে ফেল তখনই ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোনো নেক আমল করে নিয়ো। (যাতে অন্যায়ের অশুভ প্রভাব ধৌত হয়ে যায়।) আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াও কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর করলেন, এটি তো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(মুসনাদে আহমদ ৩৫/৩৬৮, হা. ২১৪৮৭, তিরমিযী শরীফ ২/৭৫, হা. ৩৩৮৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮১, হা. ১৬৭৯৭, তাফসীরে দুররে মনসূর ৩/৪০৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪, হা. ১৭৮, জামেউস সগীর ১/৩৭, হা. ১১৫)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন বান্দা কোনো গোনাহ হতে তাওবা করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা'আলা 'কিরামান কাতিবীন'কে সেই গোনাহ ভুলিয়ে দেন, স্বয়ং গোনাহগার ব্যক্তির হাত-পাকেও ভুলিয়ে দেন, এমনকি জমীনের ওই অংশকেও ভুলিয়ে দেন, যার ওপর ওই গোনাহ করা হয়েছে। এমনকি তার এই গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউই থাকে না।

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْحَافِظُ ، بِأَصْبَهَانَ ، أَخْبَرَنَاأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ ، بِنَيْسَابُورَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُشْنَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعَبَّاسُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ يَعْنِي ابْنَ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْحَكَمِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَنْسَى اللَّهُ حَفَظَتَهُ ذُنُوبَهُ ، وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ "

عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أكثروا فى الجنازة قول :لا إله إلا الله

(জামিউস সগীর ১/৩০১, হা. ১৪০২, কানযুল উম্মাল ১৫/৬৫ হা. ৪২৫৭৮)

হাদীসটি মওকূফ।

খ.

এক হাদীসে আছে, আমার উম্মত যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন তাদের পরিচয় হবে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা'।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا عَبْدُوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :شِعَارُ أُمَّتِي إِذَا حُمِلُوا عَلَى الصِّرَاطِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

(মু'জামুল কাবীর [তাবারানী] ১/৭৭ হা. ১৬১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৩৫৯, মু'জামুল আওসাত, হা. ১/৫৭ হা. ১৬০, তাবকাতুশ শাফেঈয়্যা আল কুবরা ১/৩৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

গ.

অন্য হাদীসে আছে, যখন তারা কবর হতে উঠবে, তখন তাদের পরিচয় হবে

لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

وروى ابن مردويه عن عائشة مرفوعا :شعار المؤمنين يوم يبعثون من قبورهم :لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

(জামেউস সগীর, হা. ৪৮৬৯, কানযুল উম্মাল ১৪/৩৮৫, হা. ৩৯০৩২, দুররে মনসূর ৬/১৮৪, ফয়জুল কদীর ৪/১৬১)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঘ.

এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের অন্ধকারে তাদের পরিচয় হবে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা'।

عن عبد الله بن عمرو بن العاصؓ قال: قال رسول الله ﷺ شعار المؤمنين فى ظلم القيامة لا إله إلا أنت

(জামেউস সগীর, হা. ৪৮৭০, আল কামেল [ইবনে আদী] ৬/৩৯৫, দায়লমী হা. ৩৪১২)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(আততারগীব ৪/৪৮, হা. ৪৬০৫, আততাওবা [ইবনে আসাকের] হা. ১৩, তারীখে দামেশক ১২২৮৭, আল আমালী [আন উওয়াইমির] ৬১৫, তারীখে জুরজান [আন আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস] ৩৩৫, আততারগীব [আসবাহানী] হা. ৭৫১)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ.

গোনাহ থেকে তাওবাকারী এই রূপ যেন সে গোনাহ করেইনি।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

(সুনানে ইবনে মাজাহ ২/৩১৩, হা. ৪২৫০, নাওয়াদিরে উসূল ২/১৪১, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ১০/১৫৪, হা. ২০৫৬, শু'আবুল ঈমান ৫/৪২৬, হা. ৭১৭৮, আলমু'জামুল কাবীর ১০/১৮৫, হা. ১০২৮১)
হাদীসটির মান : সহীহ

গ.

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না, এমন এখলাছের সাথে আমল করো, যেন আল্লাহ পাক তোমার সামনে আছেন, নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য করো, প্রতিটি পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিকির করো (যাহাতে কিয়ামতের দিন তোমার সাক্ষীর সংখ্যা বেশি হয়), যখন কোনো অন্যায় কাজ হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নেক আমল করে নাও, গোনাহ গোপনে করে থাকলে এর কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও গোপনে করো, আর গোনাহ প্রকাশ্যে করে থাকলে এর কাফফারাস্বরূপ নেক আমলও প্রকাশ্যে করো।

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ " :اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَاذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً :السِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ "

(আল মু'জামুল কাবীর ২/১৭৫, হা. ৩৭৪, শু'আবু ঈমান [বায়হাকী] ১/৪০৫, হা. ৫৪৮, মাজমাউয যাওয়াদে ৪/২১৮, হা. ৭১২৯, জামেউস সগীর ১/২৪৭, হা. ১১৩১)
হাদীসটির মান : সহীহ (জামেউস সগীর)

হাদীস নং-৩৪ :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي الطَّبَّاعَ، قَالَ :حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ "

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমান, যে ব্যক্তি দশ বার এই দু'আ পড়বে তার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হবে–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অথবা এরূপ পড়বে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(তিরমিযী ২/১৮৫, হা. ৩৪৭৩, মুসনাদে আহমদ ৪/১০৩, হা. ১৬৯৫৪, আল-মুজামুল কাবীর ২/৫৬, হা. ১২৭৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০৪, হা. ১৮৫৭)
হাদীসটির মান : সহীহ (মুস্তাদরাকে হাকেম)

ক.

এক হাদীসে এসেছে, যখন তোমরা ফরয নামায আদায় করো তখন প্রতিটি ফরজ নামাযের পর দশ বার এই দু'আটি পড়বে :

"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير

এর সাওয়াব এইরূপ, যেমন একটি গোলাম আজাদ করল।

عن البراء بن عازبؓ قال قال رسول الله ﷺ إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا في عقب كل صلاة عشر مرات "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير "يكتب له من الأجر كأنما أعتق رقبة ـ

(জামেউস সগীর ১/১৬৪, হা. ৭৩৪, কানযুল উম্মাল ২/১৩০, হা. ৩৪৬৫)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৫

মুফতী শাহেদ রহমানী

অপচয়ের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'পানাহার করো, অপচয় করো না।' (সূরা : আ'রাফ, আয়াত : ৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

অর্থ : তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না আর একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত-২৯)

বিষয়টি হাদীস শরীফে এভাবে এসেছে :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ

অর্থাৎ পানাহার করো, সদকা করো আর পোশাক পরিধান করো, যতক্ষণ তা অপচয় ও অহংকার মিশ্রিত না হয়। (ইবনে মাজাহ, হা. ৩৬০৫)

আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অপচয় করা আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই পছন্দ করেন না। ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ :أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ :قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের তিন বস্তু পছন্দ করেন আর তিন বস্তু অপছন্দ করেন। আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তুগুলো হলো, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করা এবং সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিচ্ছিন্ন না হওয়া। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় বস্তু তিনটি হলো, অহেতুক কথা বলা, অহেতুক প্রশ্ন করা ও অনর্থক সম্পদ বিনষ্ট করা। (সহীহ মুসলিম, হা. ১৭১৫)

উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টভাবে এসেছে :

انه لا يحب المسرفين

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা : আ'রাফ, আয়াত-৩১)

আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীদের পছন্দ না করার একটি কারণ হলো, অপচয়কারীরা শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে থাকে। আর এটা হলো অবিশ্বাসী ও অহংকারীদের স্বভাব। খোদাদ্রোহী ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

انه كان عاليا من المسرفين

অর্থাৎ ফেরাউন ছিল সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (সূরা : আদদুখান, আয়াত-৩১)

কোনো ব্যক্তি অপচয় করে শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এ জন্য পবিত্র কোরআনে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

অর্থাৎ নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত-২৭)

আল্লামা বরকুভী (রহ.) বলেন, 'শয়তানের ভাই শয়তানের মতোই। এই পৃথিবীতে শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো নাম নেই। এ হিসেবে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো বিশেষণ নেই।' (আত-ত্বরিকতুল মুহাম্মদিয়্যা : ১০৩)

পোশাকে অপচয় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়

পোশাকে সাধারণত চার ধরনের অপচয় হয়ে থাকে। এক. নিজের সাধ্যের বাইরে চওড়া দামের পোশাক পরিধান করা। তাই প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাক পরিধান করা উচিত। বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অধিক মূল্যমানের পোশাক পরিহার করা নেককার, বুজুর্গ ব্যক্তিদের অভ্যাস। হাদীস শরীফে এসেছে :

مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشْرٌ :أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ

অর্থ : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতাস্বরূপ বিলাসিতা ও অধিক সাজ-সজ্জাময় পোশাক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদা ও সম্মানের পোশাক পরিধান করান। (আবু দাউদ, হা. ৪৭৭৮)

দুই. সীমাতিরিক্ত পোশাক সংগ্রহ করা। অর্থবিত্ত সঞ্চয় করা মানুষের স্বভাব। নিত্যনতুন কাপড় সংগ্রহ করাও মানুষের

অভ্যাস। একসময় এত কাপড় হয়ে যায়, পরিধানের সুযোগ হয় না। এমন সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত।

তিন. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ পোশাক পরিধান করা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। যে পোশাক পরিধান করতে শরীয়ত নিষেধ করেছে, এমন পোশাক পরিধান করা অপচয়ের শামিল। যেমন : এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা, যার ফলে সতরের অঙ্গগুলো দৃশ্যমান হয় কিংবা এমন আঁটসাঁট, সংকীর্ণ পোশাক পরিধান করা, যার ফলে দেহের গঠন ও উঁচু-নিচু স্থান প্রকাশিত হয়। এসব পোশাক পরিধান করাও অনর্থক অর্থ ব্যয় করার শামিল। এ ছাড়া নারীরা পুরুষের মতো, পুরুষরা নারীদের মতো পোশাক পরিধান করা, অমুসলিমদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি অপচয় বৈ কিছুই নয়। কেননা এতে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করা হয়। আর শরীয়তের সীমা অতিক্রম করাকেই অপচয় বলা হয়।

চার. অপচয়ের আরেক পদ্ধতি হলো অহেতুক কাপড় নষ্ট করা। অহেতুক কাপড় নষ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–অবহেলা করে কাপড় নিক্ষেপ করা, জ্বালিয়ে দেওয়া ক্রোধান্বিত হয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কাপড় ব্যবহার করাও হয় না, আবার কাউকে দেওয়াও হয় না। ফলে একসময় কাপড়টি অযত্নে পরিধানের অযোগ্য হয়ে যায়। অথচ কাপড়টি হতদরিদ্র, অসহায় মানুষকে দেওয়া হলে তাদের জীবনের উষ্ণতার ছোঁয়া লাগত। তারাও নিজেদের ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করতে পারত।

কাউকে পোশাক দান করার ফজীলত

নিজে পোশাক পরিধান করে সতর ঢাকা, লজ্জা নিবারণ করা যেমন ইবাদত, তেমনি অন্যকে বস্ত্র খণ্ড দিয়ে সতর ঢাকার ব্যবস্থা করাও ইবাদত। পোশাক হাদিয়া দেওয়া বা গিফট করা কেবল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও বন্ধুবান্ধব, সম্মানিত ব্যক্তি, পড়শি ও দরিদ্র মানুষকে পোশাক দেওয়া যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, "যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এবং এই দু'আ পড়ে :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَارِى بِهِ عَوْرَتِى، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِى حَيَاتِى،

তারপর পুরনো কাপড় অন্যদের দান করে দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আল্লাহর জিম্মাদারি ও আশ্রয়ে থাকে।" (তিরমিযী শরীফ, হা. ৩৫৬০)

দু'আটির অর্থ হলো, সব প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যিনি আমাকে বস্ত্রাবৃত করেছেন, যা দিয়ে আমি আমার লজ্জা স্থান ঢেকে নিতে পারি এবং এই কাপড় দিয়ে আমি আমার জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি। অন্য হাদীসে এসেছে :

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلٰى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقٰى مُؤْمِنًا عَلٰى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ

অর্থ : যে মুমিন অন্য মুমিনকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পানাহার করায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফলমূল আহার করাবেন। যে মুমিন পিপাসাকাতর কোনো মুমিনের তৃষ্ণা নিবারণ করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে মোহরাঙ্কিত পানীয় পান করাবেন। যে মুমিন বস্ত্রহীন কোনো মুমিনকে বস্ত্র পরিধান করাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের সবুজ রঙের পোশাক পরিধান করাবেন। (তিরমিযী, হা. ২৪৪৯)

বর্তমানে শহরাঞ্চলে দেখা যায়, পুরনো কাপড়গুলো অনেকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে দেয়। আবার কেউ কেউ গরিব-অসহায়দের তা দানও করে থাকেন। কিন্তু দান করার ক্ষেত্রে তাঁরা পুরনো কাপড়কেই বেছে নেন। অথচ এটা সুপ্রমাণিত যে, দানের বস্তু যত উত্তম হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে। তাই আমাদের উচিত, নতুন পোশাক গরিব-মিসকিনদের দান করার প্রথা চালু করা। সমাজ কাঠামো ইসলামসম্মত না হওয়ায় আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলেও মানুষের বদ্ধমূল ধারণা হলো, গরিব-অসহায়দের পোশাক দেওয়া যায় কেবল যাকাতস্বরূপ। তাও আবার 'যাকাতের শাড়ি' নামে কম দামি কাপড়! অথচ পুরো ব্যাপারটি ইসলামবিরোধী। প্রথমত, কাপড়ের মাধ্যমে যাকাত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। নগদ অর্থ, জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে দেওয়ার মাধ্যমেও যাকাত আদায় করা যায়। দ্বিতীয়ত, যাকাত দাতার গোটা সম্পত্তি থেকে যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাব করে বের না করে মুষ্টিমেয় কাপড় দান করলে যাকাত আদায় হবে না। তৃতীয়ত, হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করে যদি কেউ কাপড় দিয়ে যাকাত আদায় করতে চায়, সে ক্ষেত্রেও 'যাকাতের শাড়ি' না দিয়ে মধ্যমমানের পছন্দসই পোশাক দান করা উচিত। এরই সঙ্গে এ ধারণা থেকেও বের হয়ে আসা উচিত যে 'শাড়ি-লুঙ্গি-পাঞ্জাবি দিয়ে যাকাত আদায় করতে হয়।' সুতরাং জানা গেল, যাকাতবহির্ভূত অর্থ থেকে বছরের যেকোনো সময় কাউকে পোশাক দান করা বা হাদিয়া দেওয়া বিশেষ ফজীলতপূর্ণ ইবাদত। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِى حِفْظٍ مِنَ اللّٰهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ

অর্থ : যখন কোনো মুসলিম অন্য মুসলিমকে পোশাক পরিধান করায় তখন দানকারী আল্লাহর হেফাজতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত দানকৃত ব্যক্তি সে পোশাকের টুকরো বিশেষও ব্যবহার করতে থাকে। অর্থাৎ কাপড়টি পরিত্যক্ত হওয়া পর্যন্ত দানকারীকে আল্লাহ

তা'আলা বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করেন। (তিরমিযী, হা. ২৪৮৪)

অহংকার ও সুখ্যাতির জন্য পোশাক পরিধান করা হারাম

'লোক দেখানো পোশাক' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। 'লোক দেখানো পোশাক' কাকে বলে? সাধারণভাবে বলা যায়, যে পোশাকের মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য হয়, সে পোশাকই লোক দেখানো পোশাক। (বযলুল মাজহুদ : ১৬/৩৫৬)

আজকাল ঈদ ও বিয়ের সময় বিশেষভাবে দেখা যায়, কে কার চেয়ে দামি ও গর্জিয়াস পোশাক কিনতে পারে, এর প্রতিযোগিতা চলছে। কাপড়ের ডিজাইন 'আন কমন' ও সবার পছন্দসই হবে কি না, ক্রেতার মাথায় এই চিন্তাই ঘুরতে থাকে। অথচ ইসলামী শরীয়ত মতে, পোশাক হলো প্রয়োজন পূরণের জন্য লজ্জা নিবারণের জন্য, সুস্থ ও সতেজ থাকার জন্য। তা ছাড়া লোক দেখানো ও খ্যাতির মনোভাব পরিহার করেও সুন্দর, শালীন পোশাক পরিধান করা যায়। ইসলামের নির্দেশনাটা এখানেই। ইসলাম লজ্জানিবারক, স্বস্তিদায়ক ও সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক পরিধানে উৎসাহী করেছে। অন্যদিকে যশ, খ্যাতি ও দাম্ভিকতাপূর্ণ পোশাক পরিধানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

লৌকিকতাপূর্ণ পোশাক পরিধানের বিভিন্ন পর্যায়

লৌকিকতাপূর্ণ ও লোক দেখানো পোশাক পরিধানের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। প্রথমত, অধিক পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা। গোড়াতেই এটি হারাম ও নাজায়েয। দ্বিতীয়ত, অহংকার ও দম্ভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা। তৃতীয়ত, এমন পোশাক পরিধান করা, যার মাধ্যমে দরিদ্রদের কাছে নিজের বড়ত্ব জাহির করা হয় কিংবা তাদের অন্তরে আঘাত করা উদ্দেশ্য হয়। চতুর্থত, এমন পোশাক পরিধান করা, যার ফলে মানুষের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয় এবং এর মাধ্যমে লোক হাসানো উদ্দেশ্য হয়। পঞ্চমত, এমন পোশাকও লৌকিকতাপূর্ণ পোশাকের অন্তর্ভুক্ত, যা বাহ্যত আবেদ-যাহেদদের পোশাক, কিন্তু এর মাধ্যমে নিজের সুফি ভাব ও বুজুর্গি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়। ষষ্ঠত, অযোগ্য লোকেরা যোগ্য ও পদবিধারী ব্যক্তিদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করা। যেমন–মূর্খ হয়ে মুফতীদের মতো পোশাক পরিধান করা। উল্লিখিত ছয়টি উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা হলে তা লোক দেখানো ও লৌকিকতাপূর্ণ পোশাক বলে গণ্য হবে। (মেরকাত : ৭২৭৮২)

লৌকিকতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করার ওপর হাদীসের হুঁশিয়ারি

লৌকিকতা, আত্মপ্রচার ও লোক দেখানোর মানসে পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে ইসলামে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে :

مَنْ لَبِسَ رِدَاءَ شُهْرَةٍ، أَوْ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللّٰهُ نَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য পোশাক পরিধান করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে আবি শাইবা, হা. ২৫২৬৬)

অন্য হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খ্যাতির জন্য পোশাক পরিধান করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাবেন। অতঃপর এর ভেতর আগুন প্রজ্বালন করবেন। (ইবনে মাজাহ : ৩৬০৭)

লৌকিকতা পছন্দকারী ব্যক্তি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। এর ফলে আল্লাহ ওই ব্যক্তি থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে নেন।

হাদীস শরীফে এসেছে :

عَنْ أَبِى ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى يَضَعَهُ مَتٰى وَضَعَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খ্যাতির জন্য পোশাক পরিধান করে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বিমুখ হয়ে যান, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা পরিহার না করে। (শু'আবুল ঈমান : ৫৮২০, ইবনে মাজাহ : হা. ৩৬০৮)

আর আল্লাহ তা'আলা যার থেকে বিমুখ হয়ে যান, স্বাভাবিকভাবে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ ثَوْبًا لِيُبَاهِىَ بِهِ، فَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ حَتّٰى يَنْزِعَهُ مَتٰى مَا نَزَعَهُ

অর্থ : যে ব্যক্তি অহংকার প্রদর্শনের জন্য পোশাক পরিধান করে অতঃপর মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, আল্লাহ এমন ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা খুলে না ফেলে। (তাবারানী কাবীর : ২৩/২৮৩)

আর যার দিকে আল্লাহ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না, তার ইহকাল ও পরকাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেকোনো সময় সে আল্লাহর আজাবে পতিত হতে পারে। এমনই এক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে হাদীস শরীফে। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْأَرْضِ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থাৎ এক ব্যক্তি হেলেদুলে হাঁটতেছিল। তার লম্বা লম্বা চুল ও দেহের (ওপর-নিচের) পোশাকদ্বয় তাকে আত্ম-অহংকারী করে তোলে। এ অবস্থায় সে মাটিতে দেবে যায়। কিয়ামত অবধি এভাবে সে দেবে যেতে থাকবে। (মুসলিম শরীফ : হা. ২০৮৮)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

মাদরাসা-মসজিদেও এরূপ হয়ে থাকে :
কোরআন ও কিতাবের ইজ্জত প্রসঙ্গেই বলছিলাম। বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসায় দেখা যায়, পবিত্র কোরআনের যথাযথ ইজ্জত দেওয়া হয় না। কোরআন তিলাওয়াত করা হলো, আর উঠিয়ে রেখে দেওয়া হলো। এক জায়গায় আমি পবিত্র কোরআন শরীফের আলমারি খুলে দেখেছিলাম। তাতে দেখলাম, পবিত্র কোরআন রাখা ছিল না; বরং পড়ে ছিল। (নাউজু বিল্লাহ) অর্থাৎ সুন্দর-সুবিন্যস্ত আকারে রাখা হয়নি। বরং উল্টোসিধে পড়ে ছিল। একে রাখা বলে না বরং পড়ে আছে বলা যায়। (নাউজু বিল্লাহ) আমি তথাকার দায়িত্বশীলদের ডেকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তাঁরা বললেন, ছাত্ররা এমন করে থাকে। আমি বললাম, বুঝলাম ছাত্ররা করে থাকে; কিন্তু আপনারা শিক্ষক, আপনাদের দায়িত্ব কী? আপনাদের দায়িত্ব হলো ছাত্রদের বারবার এসব কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মনে রাখতে হবে, এটি আপনাদের দায়িত্ব। সব সময় আপনাদের তত্ত্বাবধান করতে হবে, খোঁজখবর নিতে হবে। তাদের বলুন, একজন সাধারণ লোক এসে যদি এসব দেখে তাহলে তারা কী বলবে? পবিত্র কোরআনের সাথেও এরূপ অবহেলা করা হচ্ছে।

বড় আফসোসের বিষয়। পবিত্র কোরআনের ইজ্জত-সম্মানে খুবই কমতি হচ্ছে।

একটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমি গেলাম। তাদের দরসেগাহ, মসজিদ–সব স্থান আমি ঘুরেফিরে দেখলাম। অনেক কিছু আমার নজরে পড়ল। আমি কাউকে কিছু বললাম না। মাদরাসার দায়িত্বশীলকে বললাম। পবিত্র কোরআনের সাথে এসব কী আচরণ করা হচ্ছে? এরূপ মূল্যবান স্থানে পবিত্র কোরআনের এ অবস্থা না হওয়া উচিত। মানুষ তো আপনাদের থিউরি গ্রহণ করবে। আপনারা তো মুসলমানদের মরজা। অনেক সময় দায়িত্বশীলদেরও এসব বিষয়ে অবহেলা থাকে। এ ক্ষেত্রে সব সময় সচেতন থাকা আবশ্যক।

আযানের ওয়াক্তের শরঈ হুকুম :
আরেকটি মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি। কোনো ব্যক্তি পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত বা যিকিরে রত আছেন। মসজিদে হোক বা অন্য স্থানে। যখন আযান আরম্ভ হবে তখন তিলাওয়াত আর যিকির বন্ধ করে দেবে এবং আযানের জবাব দিতে থাকবে। কিন্তু যদি কোথাও দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা হয়, ওয়াজ-নসীহত হয়, দ্বীনি বিষয়ের দরস দেওয়া হয় তার জন্য এই বিধান নয়। তবে ওয়াজ-নসীহত ও দরস বন্ধ করে দিতে নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি কথা শেষ হয়ে যায় তবে বন্ধ করে দিন। যদি কথা শেষ না হয়, সময়ও কম থাকে তাহলে কথা জারি রাখুন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুকুম। ডাক্তার সাহেব থার্মোমিটার দিয়ে যদি বলেন, জ্বর ৯৮। তখন বলা হবে চলো। যদি বলেন, ৯৯ তখন বলবে জ্বর হয়েছে। খানাপিনায় পরিবর্তন করো। বোঝা গেল, অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুম লাগবে।

কোনো বিষয়কে অন্য বিষয়ের ওপর কিয়াস না করা চাই :
এক মাসআলাকে আরেক মাসআলার সাথে নিজে নিজে কিয়াস না করা চাই। অনেক দিনের পুরনো ঘটনা। একজন মুরব্বির বয়ানে শুনছিলাম। বয়ানের পর লোকেরা বসে পড়তেন। অনেক সময় হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ, সালাম বিনিময় ইত্যাদি করা হতো। এরূপ বয়ান শেষে বসার সময় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হুজুর! কোনো ব্যক্তি যদি জোহরের সুন্নাতে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা পড়ল বাকি দুই রাক'আত সূরা ফাতিহা দিয়ে শেষ করল। এরূপ নামাযের কী হুকুম? হুজুর উত্তর দিলেন, সুন্নাত আদায় হবে না। পাশে এক বৃদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি বললেন, সুন্নাত কি আদায় হবে না। হুজুর বললেন, আদায় হবে না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি সুন্নাত আদায় হবে না। হুজুর বললেন, আদায় হবে না। তাঁর চোখ-মুখে বিতৃষ্ণার ভাব দেখে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আপনি এতবার বিষয়টি জিজ্ঞেস করছেন কেন? ওই বৃদ্ধ কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন আমি ৫০ বছর থেকে সুন্নাত এভাবে পড়েছি। প্রথম দুই রাক'আতে সূরা পড়েছি আর বাকি দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়েছি। কারণ, আমি ফরজে যেভাবে, সুন্নাতেও সেভাবে পড়েছি।

দেখেন, মাসআলা না জেনে একটি আরেকটির সাথে কিয়াস করার কারণে কী অবস্থা হলো! ৫০ বছরের সুন্নাতগুলো তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। তাই দ্বীনের একটি মাসআলা শিক্ষা করা গুণের বিবেচনায় শত রাক'আত নামায থেকেও উত্তম।

উত্তম মুসলমান কে?
প্রতিটি বস্তুর দুটি স্তর থাকে। উত্তম আর অধম। সুতরাং উত্তম মুসলমান কে? হাদীস শরীফে এসেছে–

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (مشكوٰة ١/١٢)

উত্তম মুসলমান হলো সে, যে কাউকে হাতে বা মুখে কষ্ট না দেয়।

মানুষ তো মানুষই, কোনো প্রাণীও যেন কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। এতদসম্পর্কে এমন নির্দেশও আছে যে, কোনো প্রাণীকে গালি পর্যন্ত দিয়ো না। কারণ ছাড়া তাদের আঘাত করো না। তাদের ওপর অতিরিক্ত ভারী বোঝা যেন উঠিয়ে দেওয়া না হয়। এমনও আছে যে, তাদের খানাপিনাতে যেন কমতি না করা হয়।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

হারানো প্রশান্তির সন্ধানে

দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে জীবন। আত্মা-রূহ মূল জিনিস। আত্মা বের হয়ে গেলে জীবন থেমে যায়। দেহ পড়ে থাকে লাশ হয়ে। একসময় যা পচেগলে মাটির সাথে মিশে যায়। এটাই চির সত্য, দ্বিমত কারো নেই।

বিজ্ঞানের এ যুগে মানুষ উন্নতির সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। দূরত্বকে করেছে মুঠোবন্দি। আওয়াজ গতি এবং বাতাসকে করেছে বিভিন্ন আবিষ্কারে সংরক্ষণ। গরমে কৃত্রিম ঠাণ্ডা, শীতে কৃত্রিম গরমের ব্যবস্থা করেছে, সুখ-শান্তি ও বিলাসীতার উপায়-উপকরণের কোনো অন্ত নেই। পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য কতই না যান আবিষ্কার করেছে। আর আহারীয় ও পানীয় বস্তুর ফিরিস্তি হবে কয়েক মাইল দীর্ঘ। উন্নতির এই গতি কোথায় গিয়ে থামবে বলা মুশকিল। স্বীকার করতে বাধ্য যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ থেকে সহজতর হতে চলেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এর থেকে উপকৃত হচ্ছে।

মতাদর্শের বিভক্তি

বর্তমান পৃথিবীতে মৌলিকভাবে দুই ধরনের মতাদর্শ পাওয়া যায়,

এক. অধিকাংশের মত হলো, আবিষ্কার করো আর উপভোগ করো। ব্যস, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য, যৌবন কয়েক দিনের সম্পদ, ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যৌবনের মজা লুটে নাও। তাদের নিকট পবিত্রতা চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সভ্যতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞাই আলাদা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশুত্বকেও হার মানায়।

দুই. স্বচ্ছ কলবের অধিকারী আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছেন, যাঁদের মতাদর্শ প্রথমোক্ত লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পার্থিব উপকরণের প্রতি তাঁদের তেমন আকর্ষণ নেই। যার কারণে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাঁদেরকে মধ্যযুগীয় সেকেলে এবং বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের শত্রু ভাবে। তার পরও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতাদর্শীরা নিজেদের আদর্শে অটলই থাকে না বরং এটাকে রক্ষাকবচ বিশ্বাস করে দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাতে একমাত্র উসিলা মনে করে। আর এরাই যে সত্যের ধ্বজাধারী বাস্তববাদী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু উৎকর্ষের এ যুগে জীবনের কোনো এক ফাঁকে একটি জিনিস হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। যেটা হলো আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা। মানুষ আজ শারীরিক প্রশান্তি পাচ্ছে কিন্তু অন্তরের প্রশান্তি তার থেকে বহু ক্রোশ দূরে। মানুষ ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে তবে অন্তরের প্রশান্তি অধরা সোনার হরিণ। টাকার বিনিময়ে শান্তির আসবাব তো কিনছে কিন্তু বাস্তবে শান্তি তাদেরকে ধরা দেয় না।

ভিন্ন মতাদর্শীরা অশান্তির শিকার এটা মানা যায়, কারণ তারা তো শান্তির মূলমন্ত্র ঈমান থেকে বিচ্যুত। কিন্তু আফসোস! আজ অসংখ্য ঈমানদারও অশান্তির শিকার অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত। চতুর্দিকে শুধু মুসিবত, দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তির আলোচনা। রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে, গাড়ি-বাড়ি–এমনকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ এবং ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসেও একই আলোচনা।

যিকরুল্লাহই দিতে পারে আত্মার প্রশান্তি

চরম দুঃখ-দুর্দশা ও মুসিবতের সময় কী করলে অন্তরের স্থিরতা লাভ হবে? কোন উপায় অবলম্বন করলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে? এটা এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তরের মূল্য পৃথিবীর চেয়েও অনেক বেশি!

একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর ওহীয়ে এলাহী, অর্থাৎ কোরআন-হাদীসে অনুসন্ধান করা বাধ্যতামূলক জরুরি। কোরআনের ছোট্ট একটি আয়াত এই মহামূল্যবান প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে। ইরশাদ হচ্ছে–

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থাৎ কান খুলে শোনো! আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। ছোট এই আয়াতে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে পৃথিবীবাসী শান্তির যতই উপকরণ আবিষ্কার করুক প্রকৃত শান্তি তখনই লাভ হবে, যখন আল্লাহর যিকির থেকে বেখবর অলস না হবে। যিকরুল্লাহর দৌলত যার লাভ হবে দুনিয়ার সব দৌলত তার সামনে তুচ্ছ মনে হবে। দুনিয়ার শান্তির কোনো আসবাব তার কাছে না থাকলেও কোনো দুঃখ নেই। আল্লাহর যিকির করার মতো মহান দৌলত তার লাভ হয়েছে এতটুকুই তার প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। আরে ভাই! দুনিয়ার সব দুঃখ দরদ তো প্রাণঘাতী কিন্তু আল্লাহর যিকির জীবন দানকারী। যিকরুল্লাহই দুঃখ দরদের আসল পথ্য। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ :قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ

অর্থাৎ শোকর গুজার কলব এবং আল্লাহর যিকিরকারী জিহ্বা যার লাভ হয়েছে সে মূলত দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ নিজের করে নিয়েছে। (আল মু'জামুল কাবীর, হা. ১১২৭৫)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فاذكرونى اذكركم واشكروالى ولا تكفرون-

অর্থাৎ তোমরা আমার যিকির করো আমি তোমাদের স্মরণে রাখব। আর আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (বাকারা-১৫২)

একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গঠন করেছেন। ধরার জন্য হাত দিয়েছেন, চলার জন্য পা দিয়েছেন, খাওয়ার জন্য মুখ দিয়েছেন, সংরক্ষণ ও হজমের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন। ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাক দিয়েছেন, দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন, বর্জ্য বের হওয়ার সুব্যবস্থাও করেছেন, আরো কত কিছু...। মহান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন কেউ কি আছে, যে আমাদের এসব নেয়ামত দিতে পারে? জীবনযাপনের জন্য আহারীয় ও পানীয় বস্তু, পরিধেয় বস্ত্র, জায়গাজমি, টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি কে দিয়েছে? মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে কি এসব নেয়ামত অর্জনে সক্ষম? কখনোই নয়! যে আল্লাহ আমাদের সব কিছুই দিলেন তিনি মহান রব ও খালেক হওয়ার দাবি তো এটাই যে আমরা তাঁর নেয়ামতসমূহ ও ইহসানের সর্বক্ষণ স্মরণ করব। তাঁর প্রতি মহববতের বহিঃপ্রকাশ করব, তাঁর মর্জির খেলাপ কোনো কাজ করব না। তাঁর ইবাদত করব, যা করতে বলেছেন–করব। যা করতে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকব। কোনো গোনাহে লিপ্ত হলে তাওবা ইস্তিগফার করব। তাঁর যিকির করব তবে তিনিও আমাদের স্মরণ করবেন।

অভিযোগ

অনেকে অভিযোগের স্বরে বলে যে আল্লাহ আমার কথা শোনে না! আমার দু'আ কবুল করে না! (নাউযু বিল্লাহ) আচ্ছা বলুন তো! আমরা আল্লাহর হুকুম আহকাম কতটুকু মেনে চলি, তাঁর কথা কতটুকু শুনি? আরে ভাই! এক হাতে তালি বাজে না দুই হাতের প্রয়োজন হয়! সুতরাং আমরা যদি আল্লাহর কথা শুনি তবে আল্লাহও আমাদের কথা দু'আ শুনবেন কবুল করবেন। যেকোনো জিনিস পেতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। পাওয়ার শর্ত পূরণ না করে পেতে চাওয়া বোকামি নয় কি? আল্লাহর যিকিরের মধ্যে যেই বরকত, মজা, স্বাদ, প্রফুল্লতা এবং প্রশান্তি রয়েছে, তা এমন কোনো ব্যক্তির কাছে গোপন নয় যে কিছুদিন হলেও আল্লাহর যিকির করেছে। আল্লাহর যিকিরের বৈশিষ্ট্যই হলো মনের প্রশান্তি।

যিকির যতটুকু সম্ভব করো

দেখুন! আল্লাহর যিকিরের ফজীলতসংক্রান্ত ও এর প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক কোনো আয়াত বা হাদীস যদি না থাকত তবুও মহান নেয়ামতদাতা আল্লাহর যিকির থেকে কেউ একমুহূর্তের জন্য বেখবর থাকতে পারে না। মানুষ যেখানেই যেভাবেই থাকুক আল্লাহর যিকির করবে, এটা তার সামর্থ্যের আওতাধীন বাহিরে নয়। অবসরে মুখে আল্লাহর যিকির করবে। আর ব্যস্ততায় মন ও দিল থাকবে তাঁর যিকিরের প্রতি নিবিষ্ট।

আল্লাহর যিকির গুনে গুনে করতে হয় না। এর জন্য কোনো বিশেষ সময়ের শর্ত নেই। তাসবীহ ছড়া রাখতে হয় না, স্বশব্দে করতে হয় না। ওজু লাগে না কিবলামুখী হতে হয় না। বিশেষ কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই। বসে বসে করতে হবে এমন কোনো কথাও নেই। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, করতে পারবে। এবার বলুন! আল্লাহর যিকির করতে সমস্যা কিসের?

শয়তান অনেককে ধোঁকা দেয় যে মন তো দুনিয়ার প্রতি লেগে আছে সুতরাং মুখে আল্লাহর নাম জপলে ফায়দা কী হবে? মনে রাখবেন, এটা ভুল ধারণা, মনে মনে সাওয়াবের নিয়্যাত করে মুখে আল্লাহর নাম নেওয়া শুরু করার পরে অন্তর অন্যদিকে ধাবিত হলেও সাওয়াব পাওয়া যাবে। শর্ত হলো, নিয়্যাত পরিবর্তন হতে পারবে না।

মনের প্রশান্তির আসল পুঁজি কী?

ভগ্ন হৃদয়ের প্রশান্তি আল্লাহর যিকিরেই নিহিত। অশান্ত মনে শান্তি আনতে পারে একমাত্র আল্লাহর যিকির। আল্লাহর যিকির ব্যতীত সুখ-শান্তির সন্ধানে যেখানেই যেভাবেই যেকোনো উপায়েই যাওয়া হোক না কেন, চুলকানির ন্যায় বাহ্যিক-সাময়িক প্রশান্তি লাভ হয়েছে মনে হলেও শেষ পরিণাম জ্বালা-যন্ত্রণা, অশান্তি ও অস্বস্তি ছাড়া কিছুই নেই। এটি কোনো ব্যক্তির কথা নয় স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনের কথা–

الا بذكر الله تطمئن القلوب

একটু শান্তি পাওয়ার আশায় মানুষ ক্লাবে যায়, সেখানে জৈবিক চাহিদা পূরণ হয় বটে। কিন্তু পরিণাম পারিবারিক অশান্তি, কলহ-বিবাদ আর মরণব্যাধি তো আছেই। জানাজানি হলে সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয় তো তাড়িয়ে বেড়ায়ই। অনেকে বিশেষ করে, যুবক শ্রেণী ইন্টারনেটে শান্তি খুঁজে বেড়ায়। সেখানে তারা কী চায়, কী পায়, কী দেখে, কী পড়ে, কী করে–তা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর দেখানোর প্রয়োজন নেই। অনেকে একটুখানি শান্তি পাওয়ার আশায় নেশা করে। শান্তির মানে কি নেশাগ্রস্ত হওয়া? অনেকে প্রমোদভ্রমণে যায়; কিন্তু কী পায়? অনেকে ফিল্ম দেখে, গান শোনে। এর দ্বারা তারা কি প্রশান্তি পেয়েছে? মানুষ তার ধারণায় প্রশান্তির উপকরণ এমন সব কিছুই তো একে একে ব্যবহার করে চলেছে কিন্তু শান্তি অধরাই রয়ে গেছে। কারণ সে আসল পুঁজি ও উপকরণ অবলম্বনে অনাগ্রহী। অতএব এখন প্রয়োজন এই বাস্তবতাকে নিজে বোঝা এবং অন্যকে বোঝানো। মাছের জীবন, সুখ-শান্তি পানিতে, স্থলে নিক্ষেপ করে তাকে সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো বলে সম্বোধন করলে সে সুখ-শান্তি কোনোটাই পাবে না। বরং ছটফট করতে করতে তার মরণ অনিবার্য। তেমনি মানুষের মনের স্থিরতা-প্রশান্তি আল্লাহর যিকিরে সীমাবদ্ধ। অন্য কিছুতে তার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বেশি বেশি যিকির করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

বিভিন্ন গোমরাহ দল : উলামায়ে কেরামের করণীয়

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

(গত মার্চ ২০১৪ ইং মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের মূল্যবান বয়ান।)

بسم الله الرحمن الرحيم
بعدالحمدوالصلاة .قال الله تعالى : وجادلهم بالتى هى أحسن .وقال النبى صلى الله عليه وسلم :-يكون فى آخرالزمان دجالون كذابون .يأتونكم من الأحاديث مالم تسمعوأنتم ولاآباؤكم. فإياكم وإياهم لايضلونكم ولايفتنونكم. وقال النبى صلى الله عليه وسلم :-رب حامل فقه غيرفقيه .أوكماقال النبى صلى الله عليه وسلم .-

মুহতারামুল মাকাম, উস্তাযুল কুল, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের মুরব্বি, আমারও খাছ মুরব্বি, ফকীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দাঃ বাঃ এবং উপস্থিত অন্যান্য উলামায়ে কেরাম!

আল্লাহর খাছ মেহেরবানি যে দ্বীনের হেফাজতের দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্য কোরআন নাজিল করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রতিটি শব্দ, অর্থ ও তার ওপর আমলসহ সব কিছুর হেফাজতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। যার প্রকৃত অর্থ এই যে যখনই কোনো দিক থেকে এর ওপর কোনো আক্রমণ আসবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাছ বান্দাদের মধ্য হতে কিছু বান্দাকে দাঁড় করে দেবেন। তারা এর মোকাবিলা করে বাতিলকে খতম করে দেবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী– ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض আল্লাহ তা'আলা যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন (সূরা বাকারা : ২৫১) এর মধ্যে بعضهم ببعض এর অর্থ এটাই। যদি আল্লাহ হক্বের দ্বারা বাতিলের মোকাবিলা না করতেন তাহলে এই জমিনে টিকে থাকা সম্ভব হতো না বরং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ত।

আমি শুকরিয়া জানাই মুফতী সাহেব হুজুরের, বর্তমানে সহীহ হাদীস মানার নামে যে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; তিনি সবার আগে এটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যদিও তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কমজোর হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বীনের কাজের ব্যাপারে আমাদের মতো হাজারো কিংবা লাখো আলেমের চেয়েও তিনি বেশি সতর্ক ও সমঝদার। ওরা আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে এবং জনসাধারণকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার পাঁয়তারায় লিপ্ত হচ্ছে। এমন মুহূর্তে জনগণকে এই ফিতনা থেকে বাঁচানো দরকার; এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে এ ব্যাপারে সম্মেলন হয়েছে এবং গতকাল উত্তরবঙ্গের 'বগুড়া জামিল মাদরাসা'য় সম্মেলন হলো। এলাকার বহু উলামায়ে কেরাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া সেখানে তিন দিনব্যাপী একটি তারবিয়াতী কোর্সের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল; যেন এ ব্যাপারে জনসাধারণ একটি মজবুত ধারণা নিতে পারেন; এবং সহজে এ ফিতনার প্রতিরোধ করতে পারেন। তথ্য-উপাত্ত সবার কাছেই আছে, কিন্তু সেটা পেশ করার তরীকা সবার জানা নেই। কোরআন-হাদীসে নতুন কিছু নেই, নতুন বললে তো বিদ'আত হয়ে যাবে। যা বলব তা তো আপনাদের কাছেই আছে।

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن (সূরা নাহল : ১২৫)

সেই 'আহ্সান' তরীকাটা কী? কিভাবে বললে এই ফিতনা দূর হবে? আমরা নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা করতে পারব, জনগণকে রক্ষা করতে পারব; এর কিছু হিকমত ও কৌশল নিয়ে আপনাদের সামনে মুযাকারা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা যদি সেগুলো লিপিবদ্ধ করেন, রেকর্ড করেন এবং পরস্পর আলোচনা করেন; তাহলে আশা করা যায় এই ফিতনা দ্রুত খতম হয়ে যাবে। এভাবেই যুগে যুগে বাতিল মাথাচাড়া দেয়; এর মধ্যে এ হিকমত থাকতে পারে যে উম্মতের দ্বীনি বিষয়ে উলামায়ে কেরাম কতটুকু চিন্তিত আল্লাহ তা'আলা তা পরীক্ষা করেন। এ জন্য যখনই বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; তখনই হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম তাদের মোকাবিলা করে; জনগণের সামনে তাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা লেজ গুটিয়ে পালায়।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুফতী সাহেবের হায়াতে বরকত দান করুন এবং তাঁর হায়াতকে আমাদের মাঝে দীর্ঘায়িত করুন।

আজকের 'সম্মেলন' সময়ের এক আহাম দাবি, যা তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন। এবং আপনাদেরকে দাওয়াত করে এনেছেন। শুধু তা-ই নয় বরং আপনাদের আত্মিক খোরাক দেওয়ার জন্য ভারতের একজন মেহমানকে দাওয়াতও দিয়েছেন। দু'আ করেন যেন আল্লাহ তা'আলা মেহমানকে সহীহ-সালিম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাঁর থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ফিতনার পূর্বাভাস :

'হাদীসের নামে' এমন একটা ফিতনা যে মাথাচাড়া দেবে; মানুষকে বিভ্রান্ত

করবে; খাঁটি মুসলমানদের মুশরিক বলবে; হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ও দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমি একটি হাদীস পড়েছি। আপনারা সবাই বুঝেছেন যে এই হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং আমাদের করণীয় কী সে দিকনির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। আপনাদের বোঝার জন্য (এবং বরকত লাভের আশায়) তরজমা করছি। অন্যথায় আলেমদের এই মাহফিলে তরজমা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলিম শরীফের হাদীস (হা: ৭) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ

"শেষ যমানায় কিছু ফেরেববাজ ও ধোঁকাবাজের আবির্ভাব ঘটবে।" يَكُونُ শব্দ দ্বারা তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হচেছ এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশাআল্লাহ। অন্যদিকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তার একটি হরফও বাস্তবায়িত হয়নি। শুধু তার একটি বদ দু'আর বাস্তবায়ন হয়েছে। সে তার মাহফিলগুলোতে এই বলে বদ দু'আ করত যে হে আল্লাহ! আমি যদি সত্য নবী না হই তাহলে আমার মৃত্যু যেন বেইজ্জতির সাথে হয়। যেমন : আবু জাহেল বলত,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

হে আল্লাহ! মুহাম্মদের দ্বীন যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দাও। (সহীহ বুখারী : ৪৬৪৮)।

খেয়াল করুন, কেমন দু'আ? যার দু'আ করা উচিত ছিল, হে আল্লাহ! রাসূল সত্য হলে আমাদেরকে তার দাওয়াত কবুল করার তাওফীক দান করো।' সে তা না করে বলল যে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দাও। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও একই কাজ করেছে! সে বলতে পারত যে হে আল্লাহ! আমি যদি মিথ্যা নবী হয়ে থাকি তাহলে আমাকে তাওবা করার তাওফীক দান করো, আমাকে হেদায়েত দান করো। কিন্তু সে বলেছিল, আমাকে বেইজ্জতের সাথে মৃত্যু দান করো। ফলে আল্লাহ তাকে বেইজ্জতির সাথেই মৃত্যু দিয়েছেন। কাঁচা বাঁশের তাজা পায়খানায় পড়ে মারা গেছে। সে জন্য আজ পর্যন্ত টয়লেটকে কাদিয়ানীদের অফিস বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত যে কাদিয়ানীর কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই ফলেনি শুধু এই বদ দু'আটা ছাড়া। কিন্তু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন : তিনি বলেছেন, শেষ যমানায় কিছু লোক আসবে; তাদের কাজ হবে,

يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ

(সহীহ মুসলিম : ৭)

অর্থাৎ তারা লোকদের সামনে বিভিন্ন হাদীস পেশ করবে। এখানে ইঙ্গিতকৃত 'হাদীস'-এর অর্থ কী? হাদীসের অর্থ হলো তারা যা পেশ করবে সেটি হতে পারে নবীজির হাদীস। আবার এর অর্থ আমাদের কথাবার্তাও হতে পারে। আমাদের কথাবার্তাকেও হাদীস বলা হয়। এর স্বপক্ষে আমি একটি দলিল পেশ করছি। হাদীসে এসেছে,

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا يُحِبُّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا

(মুসনাদে আহমদ : ১৯৭৮১)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এশার পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পর গল্পগুজব ও দুনিয়াবী আলোচনা অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব, নেতা-নেত্রীদের আলোচনা এবং মিথ্যা সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে "الْحَدِيثَ" শব্দটি 'গল্পগুজব ও দুনিয়াবী আলোচনা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে যে তারা এমন হাদীস পেশ করবে কিংবা এমন কথা বলবে, যা তোমরাও শোনোনি এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনেনি। এই তথাকথিত 'আহলুল হাদীস' এইরূপ কথাবার্তা বলছে কি না? ১২০০ বছর পর্যন্ত যেই আবু হানীফা (রহ.)-কে সবাই শ্রদ্ধা করে আসছে, মহব্বত করে আসছে এরা তাঁকে গালি দিচ্ছে। অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ আলেম জটিল মাসআলায় তার তাকলীদ বা অনুসরণ করে। তবে হ্যাঁ, সহজ মাসআলায় কাউকে তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। নামায পাঁচ ওয়াক্ত এখানে কোনো তাকলীদ নেই। কিছু মাসআলা জটিল আছে। সেখানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই চেয়েছেন যে মাযহাব সৃষ্টি হোক; অন্যথায় আল্লাহ সুস্পষ্ট শব্দ নাজিল করতেন। দুই অর্থবিশিষ্ট 'শব্দ' নাজিল করতেন না। তিনিই চেয়েছেন যেন, ওই সব জায়গায় আমরা মাযহাব মানি। আমরা তো আবু হানীফা (রহ.)-কে নবী মানি না। অথচ ওরা এই অপবাদ দিচ্ছে যে তোমরা তাকে নবী মানো। সুতরাং তোমরা বেঈমান, মুশরিক হয়ে গেছো। আমাদের ঢাকা মোহাম্মদপুরের এক লোক এই তথাকথিত 'আহলুল হাদীস' হয়েছে। এখন কোনো হানাফী তাকে সালাম দিলে সে তার উত্তরে বলে,

وعليكم السلام ورحمة الله على من اتبع الهدى

অর্থাৎ কাফেরদেরকে যেই 'শব্দ'-এর মাধ্যমে সালাম দিতে বলা হয়েছে, তারা হানাফীদেরকে সে ধরনের শব্দ দ্বারা সালামের উত্তর দিচ্ছে! (নাউযু বিল্লাহ)। ঢাকা মোহাম্মদপুর 'রেসিডেনসিয়াল হাই স্কুল'-এর পাশে 'আলআমীন' নামে ওদের একটি মসজিদ আছে। ওইখানে দু-তিন মাস পর পর সম্মেলন হয়। সেখানে একজন দাঁড়িয়ে বলবে যে, আমি গত মাসে মুসলমান হয়েছি! কেউ বলে, আমি তিন মাস আগে মুসলমান হয়েছি! একেকজন একেক রকম বলে। কেউ আবার জিজ্ঞেস করে যে আপনি আগে কোন ধর্মে ছিলেন? সে উত্তরে বলে, আমি আগে হানাফী ধর্মে ছিলাম; সেখান থেকে তাওবা করে আমি এখন মুসলমান হয়েছি। نعوذ بالله من ذلك এমন কথা আপনাদের বাপ-দাদারা শুনেছেন? হানাফী থেকে কি মুসলমান হওয়া যায়? তারা আরো বলে, কাযা নামায বলতে কিছু নেই। কাযা নামাযের জন্য তাওবা করে নিলেই যথেষ্ঠ! অথচ

আপনারা জানেন যে হাদীসের প্রতিটি কিতাবে باب قضاء الفوائت "কাযা নামায আদায়" শিরোনামে বিশাল একটি অধ্যায় রয়েছে। সেখানে কাযা নামায কিভাবে আদায় করতে হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে কি তারা বলতে চাচ্ছে যে নবীজির এই শত শত হাদীস মিথ্যা? অথচ তাদের দাবি, তারা আহলুল হাদীস। আমরা বলি, প্রকৃতপক্ষে তারা আহলুল হাদীস না বরং তারা হাদীসের ঘোর শত্রু।

তারা এই ধরনের কথা দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ বুখারী শরীফ খুলে দিলে পড়তেও পারে না। শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থগুলো বগলে রাখবে, আর সবাইকে দাওয়াত দেবে–এটা বগলে রাখো। তাহলে তোমার আর মাযহাব মানা লাগবে না। ওই খান থেকে খুলে খুলে বলবে, এই যে দেখুন বুখারী শরীফে এসেছে, আমীন জোরে বলতে হবে, তোমরা হানাফীরা জোরে বলো না, কাজেই তোমাদের নামায বাতিল। অথচ বুখারী শরীফে এ ধরনের কোনো

হাদীসই নেই! দেখুন, ধোঁকাবাজি কাকে বলে! এখানেই শেষ নয়; তারা আমাদেরকে বলে, তোমাদের কাছে হাদীসের কোনো দলিল আছে? তোমাদের ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটা হাদীস জানত! বাকি সব কিয়াস করেছে। অথচ আমাদের মক্তবের ছাত্রদেরও চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ! আর যাকে সমস্ত ইমাম 'ইমামে আযম' বলেছেন তিনি জানতেন মাত্র 'সতেরখানা হাদীস'! এমন কথা তো পাগলেও বলে না।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে বলেছেন,

الناس عيال على أبى حنيفةفى الفقه

(তারিখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদি : ১৫/৪৭৩)

"ফিকহের ক্ষেত্রে সমস্ত উলামায়ে কেরাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পরিবারভুক্ত"। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) উসূল (তথা ফিকহের নীতিমালা) ইস্তিম্বাত করেছেন। আর ওই উসূলের আলোকে চারজন ইমামই কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করেছেন। তাঁরা একজনও এই উসূল পরিবর্তন করেননি এবং নতুন উসূল উদ্ভাবনও করেননি। এ ছাড়া আলহামদুলিল্লাহ! ইমাম সাহেব (রহ.) কিয়ামত পর্যন্ত আগত মাসআলার সম্ভাব্য যত সূরত হতে পারে তার অধিকাংশ সূরতের একটি ফয়সালা দিয়ে গেছেন। এ জন্যই তো আমরা আজ অনায়াসে ফাতওয়া দিতে পারছি। এই কাজটি যদি তিনি না করতেন তাহলে বিদায় হজে অবতীর্ণ এই আয়াতের অর্থ কী হতো?

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا

"আজকে আমি তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে 'পরিপূর্ণ' করে দিলাম।" (সূরা মায়েদা : ৩)। তো ইমাম সাহেব যদি এই মাসআলাগুলোর সমাধান পেশ না করতেন তাহলে আমরা এগুলো কোত্থেকে সমাধান করতাম? আর যখন সমাধান করতে পারতাম না তখন কাফেররা বলত যে, তোমাদের আল্লাহ না বলেছে তোমাদের দ্বীন 'মুকাম্মাল'? তোমাদের দ্বীনে তো বহু মাসআলার সমাধান নেই? বহু বিষয়ের কোনো উত্তর নেই! তখন আহলুল হাদীসরা কী বলবে? তারা তো কিয়াস মানে না, ইমাম মানে না, তারা ফকীহ মানে না! তাহলে এই মাসআলাগুলোর উত্তর তারা কিভাবে দেবে?

চুরি কাকে বলে

দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুফতী-ই-আযম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.), যিনি সমগ্র ভারত উপমহাদেশেরও বড় মুফতী ছিলেন। তিনি তাঁর একজন আহলুল হাদীস উস্তাদের কিসসা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একবার তিনি উস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন যে উস্তাদ হেদায়া কিতাব মুতালা'আ করছেন। জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আপনি না আহলুল হাদীস? চার ইমাম মানেন না। তাদের ইজমা-কিয়াসও মানেন না। অথচ হানাফীদের লেখা 'হেদায়া' কিতাব মুতালা'আ করছেন? উস্তাদ তো ধরা পড়ে গেলেন। বললেন, বাবা! এই যে আমাদের কাছে নতুন নতুন ফাতওয়া আসে, এগুলোর সমাধান আমরা কোত্থেকে পেশ করব? এগুলোর একটাও তো কোরআনে স্পষ্ট বলা নেই, হাদীসেও স্পষ্ট বলা নেই। এ জন্য আমরা বাধ্য হয়েই 'হেদায়া' দেখে উত্তর লেখি। এরপর কিতাবের পার্শ্ব টিকায় যে হাদীস আছে, সেটা উঠিয়ে দিই। ভুলক্রমেও 'হেদায়া'র নাম নিই না। এভাবেই ধোঁকাবাজি মধ্য দিয়ে আমাদের মতবাদটা চলছে। তিনি উস্তাদকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে জেনেশুনে এ ধরনের কাজ কেন করেন? উস্তাদ উত্তরে বললেন, আরে বোকা! এভাবে না করলে কি টাকা কামানো যায়? আসলে যে যেভাবে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সেভাবেই চালান। প্রকৃতপক্ষে যারা ভুল পথে টাকা খোঁজে আল্লাহ তাদের ভুল পথেই টাকা দিয়ে থাকেন। আপনি সহীহভাবে খেদমত করুন আল্লাহ আপনাকে সহীহভাবেই দেবেন।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "তারা এমন সব কথা বলবে, যা তোমরাও শোনোনি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনেনি।"

অতএব আপনারাই বলুন, এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে কি না? হয়েছে। এখন এই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী? মুসলিম শরীফের হাদীস নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, فإياكم وإياهم لايضلونكم ولايفتنونكم "ওদের থেকে দূরে থাকো।" "আর সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে, ফিতনায় ফেলতে না পারে।" (হা: ৭) সেই সতর্ক থাকার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আপনাদেরকে ডাকা হয়েছে এবং একত্রিত করা হয়েছে।

আমাদের করণীয়

আসুন, জেনে নিই নায়েবে রাসূল উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কী? কোরআন-হাদীস পর্যালোচনা করলে দুই ধরনের দায়িত্ব পাওয়া যায় : একটি হলো, মৌলিক দায়িত্ব, যা সব সময় করতে হবে দাওয়াত, তা'লীম ও তাযকিয়াহ। এই তিন পথে মেহনত করে পাঁচটি বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সজাগ করতে হবে। এক. আকায়েদ, দুই. ইবাদত, তিন.

মু'আমালাত, চার. ম'আশারাত, পাঁচ. আখলাকিয়্যাত। দাওয়াত, তা'লীম ও তাযকিয়াহ এই তিনটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিরাছ। শুধু একটি নিয়ে বসে থাকলে প্রকৃত নায়েবে রাসূল হওয়া যাবে না। পিতা যা কিছু রেখে যায় সন্তানরা সবাই তাতে অংশীদার হয়। এমন নয় যে বোনেরা ধানক্ষেত নেবে আর ভাইয়েরা বিল্ডিং পাবে। বরং ধানক্ষেতেও সবাই অংশীদার, আবার বিল্ডিংয়েও সবাই অংশীদার। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত তিন মেহনতের কথা তুলে ধরেছেন। এই তিন পথে মেহনত করে কী শেখাবেন? তা অন্য আয়াতে আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(সূরাতুল বাকারা : ১৭৭)।

এখানে পাঁচটি বিষয় বলা হয়েছে : ১. ঈমান ঠিক করা, ২. ইবাদত-বন্দেগী সুন্নাত মোতাবেক করা, ৩. মু'আমালাত অর্থাৎ অর্জিত সম্পদ হালাল হওয়া, ৪. মু'আশারাত ঠিকভাবে করা অর্থাৎ মা-বাবা, বিবি-বাচ্চাসহ সকলের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করা। বুখারী শরীফের হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ। (হা: ১০)

যার মর্মার্থ হলো, যে অন্যকে কষ্ট দেয় তাকে আমরা হাজী সাহেব, গাজী সাহেব, তাহাজ্জুদগুজার আরো অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু তাকে মুসলমান বলা যাবে না। যে বান্দার হক্ব নষ্ট করে, অযথা অন্যকে কষ্ট দেয় তাকে মুসলমান শিরোনাম দেওয়া যাবে না। ৫. আখলাক ঠিক করা, অর্থাৎ কাউকে কষ্ট না দেওয়া। এই পাঁচটি বিষয়ের ইলমকে বলা হয় "ইলমে ফরজে আইন"। আর মাওলানা, মুফতী, মুহাদ্দীস এগুলো হওয়া ফরজে কিফায়া। 'কিফায়া'-র জন্য দু-চারজন লোক যথেষ্ট নয় বরং 'কাফী' বা যথেষ্ট পরিমাণ লোক লাগবে, যাতে সমাজের প্রয়োজন পূরণ হয়। আমাদের দেশে এখনো 'কাফী' পরিমাণ লোক তৈরি হয়নি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মসজিদে এখন পর্যন্ত নামায সহীহ হয় না। আমি অনেকবার 'উত্তরবঙ্গ' গিয়েছি; লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়সহ আরো অনেক জায়গায় সফর করেছি। ওই সকল জায়গায় যত ইমামের পেছনে নামায পড়েছি অধিকাংশ স্থানে নামায দুহরাতে হয়েছে। কিরাত পড়েছে, ماكان محمد এর স্থলে مكان محمد আপনারাই বলেন, এর পরও কি নামায সহীহ থাকে? নামায নষ্ট হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থা দেশের আরো অনেক অঞ্চলের। সুতরাং এখনো ফরজে কিফায়া পরিমাণ লোক বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। তাই এ মুহূর্তে দেশের দ্বীনি জরুরতের ওপর দৃষ্টি না দিয়ে ডলার আর রিয়ালের জন্য বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া ঠিক হবে না। বলছিলাম, পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'আমানত পাওনাদারের কাছে পৌঁছে দাও।' (সূরা নিসা : ৫৮) প্রশ্ন হচ্ছে, আমানত কী? শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.) বহু তাফসীর গ্রন্থের হাওলা দিয়ে বলেছেন যে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, "ইলমে ফরজে আইন"। এই আমানত আল্লাহ তা'আলা উলামাদের কাছে রেখেছেন। আর এর পাওনাদার হলো মুসলিম জনসাধারণ। এই আয়াতে উলামায়ে কেরামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এই আমানত অর্থাৎ উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের ইলমকে দাওয়াত, তা'লীম ও তাযকিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়। এটা উলামাদের মৌলিক দায়িত্ব। শুধু ছাত্র পড়ালে কিংবা শুধু ইমামতি করলে এ দায়িত্ব আদায় হবে না। মুসলিম জনসাধারণের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে। দাওয়াত পেলেও যেতে হবে। দাওয়াত না পেলেও যেতে হবে। দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে, আত্মশুদ্ধির ফিকির করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

এই আয়াতে বলা হয়েছে, "(হে আমার প্রিয় হাবীব!) আপনাকে আমি যে এক বিশাল নূর দান করেছি, সেই নূর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিন।" (সূরা আনআম : ১২২) পৃথিবীর সর্বত্র এ নূরের মশাল হাতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এটা উলামায়ে কেরামের মৌলিক দায়িত্ব। সারা জীবন এটি করতে হবে।

উলামায়ে কেরামের আরেকটি দায়িত্ব হলো (যেটা মাঝেমধ্যে করতে হবে) যখনই কোনো দিক দিয়ে বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করবে তখনই ময়দানে নামতে হবে। বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলিস্যাৎ করতে হবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

শরহু মুশকিলিল আছার, ত্বহাবী : ৩৮৮৪) আমার উম্মতের মধ্য হতে যাদের তবীয়তে ইনসাফ আছে, তাকওয়া আছে; তারাই আমার এই ইলম শিখতে পারবে। সবাই শিখতে পারবে না। এরপর তাদের কাজ হবে, يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ অর্থাৎ তারা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকে বিদূরিত করবে। وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ অর্থাৎ কাফেররা কোরআন-হাদীস থেকে দলিল সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিকৃত করে উপস্থাপন করবে, যাতে নিজেদের মিথ্যা

মাযহাবকে প্রমাণ করতে পারে। ঠিক যেমনটা কাদিয়ানী এবং শিয়া সম্প্রদায় করছে। উলামায়ে কেরাম এটাকে রদ করবে। وَانْتِحَال الْمُبْطِلِين 'মুবতিল' অর্থ 'কাফের'। وَتَأْوِيل الْجَاهِلِين জাহেলদের তাফসীরকে রদ করবে। তাফসীরের আরেক নাম হলো 'তাবীল'। তবে জাহেল কাকে বলে? মনে রাখবেন, তাফসীর করার জন্য পনেরোটি বিষয়ের ইলম থাকা শর্ত। হাদীসে এসেছে–

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(শু'আবুল ঈমান, বায়হাকি : ২০৭৯)

এই হাদীসের তাফসীর দেখুন,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"রায়ের দ্বারা যে তাফসীর করবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।" (আসসুনানুল কুবরা, নাসাঈ : ৮০৩১)

আপনারা সবাই এই হাদীসটি পড়েছেন। আমি তো শুধু এখানে ইশারা করব মাত্র। এই পনেরোটি ইলম যার মাঝে থাকবে তার তাফসীর করার এবং তাফসীর লেখার অধিকার আছে। সেই পনেরোটি ইলম এই :

اشتقاق، نحو، صرف، معانى، بيان، بديع، قراءة، قصص، لغة، عقائد، فقه، حديث، ناسخ-منسوخ، أسباب النزول، تزكية الباطن

আহলুল হাদীসরা তো এই পনেরোটি ইলমের নামও বলতে পারবে না। এখন যদি তারা তাফসীর করতে আসে তাহলে তাদের বলুন, আগে এই পনেরোটি ইলমের নাম বলেন! এরপর তাফসীর করেন। যার এই পনেরোটি ইলম নেই তাকে এই হাদীসে জাহেল বলে অভিহিত করা হয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যাদের এ বিষয়গুলোতে পারদর্শিতা নেই তারা গলদ তাফসীর করবে।' উলামায়ে হক্কানীর দায়িত্ব হলো এই গলদ তাফসীরকে প্রতিহত করা। সুতরাং এই হাদীস থেকে আমরা বুঝলাম যে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব ছাড়াও আরো কিছু করণীয় আছে। তা হলো অবান্তর ব্যাখ্যাকারীদের প্রতিহত করতে হবে, মুসলিম ছদ্মবেশী কাফেররা আমাদের যে সকল দলিলের অপব্যাখ্যা করে তা খণ্ডন করতে হবে। আর মূর্খ লোকেরা; যাদের তাফসীর করার যোগ্যতা নেই, তারা যে তাফসীর করছে সেগুলো বাতিল করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, অবান্তর ব্যাখ্যাকারী কারা? প্রতিটি যমানায় এদের রূপ-চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দল একটিই। তো আমাদের যমানাতে এরা হলো এক নম্বর : রিজভী ফেরকা; যারা বলে বেড়ায় মিলাদ না পড়লে কাফের, কিয়াম না করলে কাফের, মাজারে মাজারে না ঘুরলে কাফের, উলামায়ে দেওবন্দ কাফের, জশনে জুলুস অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নবী না করলে কাফের নাউযু বিল্লাহ। অর্থাৎ কথায় কথায় কাফের ফাতওয়া দেওয়া এদের স্বভাব! এই ফিরকার হেড অফিস আমাদের মোহাম্মদপুরে; 'কাদেরিয়া তায়্যিবিয়্যাহ'। এটি কাফের বানানোর মেশিন! আমরা মানুষকে মুসলমান বানাচ্ছি, অন্যদিকে এরা মুসলমানকে কাফের বানাচ্ছে। তারা বলে যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানতেন, তিনি নাকি হাজির-নাজির! তারা আরো বলে যে নবীজিকে নূরের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজের নূর থেকে কিছু কেটে তা দিয়ে নবীজিকে সৃষ্টি করেছেন! নাউযু বিল্লাহ। আল্লাহ যে নূরের তৈরি এর দলিল কী? এই জাহেলরা এর দলিল দেয়–

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(সূরা নূর : ৩৫)।

অথচ এই আয়াতে এর কোনো দলিল নেই। বরং এই আয়াতের অর্থ : "আসমান-জমিনের সকল নূর ও আলো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লাহ নূরের তৈরি সেই কথা এখানে কোথায় পেল তারা? তিনি কিসের তৈরি তা কেউ বলতে পারবে না। কোথাও এ বিষয়ে আলোচনা নেই। এক বর্ণনায় শুধু এতটুকু জানা যায় যে, حِجَابُهُ النُّور অর্থাৎ আল্লাহ নিজেকে যে (হাজার হাজার) পর্দা দিয়ে বেষ্টনী করে রেখেছেন ওই বেষ্টনীগুলো নূরের। (সহীহ মুসলিম : ১৭৯) আর এরা বলছে যে আল্লাহ নূরের তৈরি। এগুলো আসলে বাড়াবাড়ি। সুতরাং উলামায়ে কেরামকে সেটা প্রতিহত করতে হবে। এই ফেতনার জন্মদাতা(!) আহমাদ রেজা খান। তার জন্মস্থান হিন্দুস্তানের 'উল্টাবাঁশবেরেলী' শহরে।

এই হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় দলটি হলো, তথাকথিত আহলুল হাদীস। কারণ আমরা কালেমা পড়েছি, আমরা মুসলমান; এর পরও তারা আমাদেরকে মুশরিক বলে, বেঈমান বলে। আমরা সহীহ পদ্ধতিতে নামায আদায় করি, অথচ তারা আমাদের নামাযকে বাতিল বলছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যিনি উম্মতের জন্য নিজের জীবনটা বিলীন করে গেছেন। যেই আবু হানীফা সম্পর্কে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন,

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَه نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِس

ইলমের কোনো অংশ যদি 'সুরাইয়া' নক্ষত্রে গিয়েও লুকায়, তবে সে যুগে এমন কিছু লোক তৈরি হবে, যারা ইলমকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনবে। (মুসনাদে আহমাদ : ৯৪৪০) এই হাদীসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে ঈঙ্গিত করে গেছেন। সেই আবু হানীফা (রহ.)-কে তারা গালমন্দ করছে। এগুলো কি বাড়াবাড়ি নয়? তাহলে تحريف الغالين কারা সাব্যস্ত হলো? দুটি দল : এক. রিজভী ফিরকা। দুই. তথাকথিত আহলুল হাদীস। আর 'মুবতিল' হলো, কাদিয়ানী ও শিয়া সম্প্রদায়। 'মুবতিল' হতে হলে কাফের হতে হবে। সে জন্য সংগত কারণেই এই দুই ফিরকা কাফের। কাদিয়ানীরা কাফের নতুন নবী মানার কারণে; আর শিয়ারা কাফের নতুন নবীর চেয়ে পাওয়ারফুল ইমাম মানার কারণে। এত পাওয়ারফুল ইমামই যদি আসে, তো এর চেয়ে নবী আসাই ভালো ছিল! শিয়াদের ধর্মগুরু খোমেনি বলেছে, আমাদের ইমামের এত বড় মাকাম যে কোনো ফেরেশতা, কোনো নবী-রাসূল তার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না।' তো এমন ইমাম যদি আসতে পারে

তাহলে নবী আসতে সমস্যা কী? এটা সুকৌশলে খতমে নবুওতের অস্বীকৃতি। তাদের কুফরির আরেকটি নমুনা হলো, তারা আমাদের এই কোরআন শরীফকে মানে না। তারা বলে, এটা আসল কোরআন শরীফ নয়। আসল কোরআন শরীফ হতে হলে সতেরো হাজার আয়াত থাকতে হবে! আর আমাদের কোরআন শরীফে মোট আয়াত ৬২৩৬টি। ৬৬৬৬ এর যে প্রচলন হয়েছে সেটা ভিত্তিহীন। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো কাফের চ্যালেঞ্জ করে যে আপনাদের কোরআনে কত আয়াত? আর কেউ বলে ফেলে ৬৬৬৬। তখন ওই কাফের বলতে পারে যে ক্যালকুলেটর নিয়ে এসেছি একটু হিসাব মিলিয়ে দেন! সূরা 'বাকারা'র এত আয়াত, সূরা 'আলে-ইমরান'-এর এত আয়াত, সূরা 'নিসা'র এত আয়াত–সব মেলালে ৬২৩৬ হয় বাকি ৪৩০ আয়াত কোথায়? মিঞা! মুসলমান দাবি করেন, অথচ কোরআনের কতটি আয়াত সে খবর রাখেন না! আবার আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছেন! কাফেররা কি কম শয়তান? আমার এক ছাত্র একবার এক কাফেরকে বলল, ভাই! কালিমা পড়েন। ওই কাফের বলল, আমরা তো প্রতিদিন কালিমা পড়ি। ছাত্রটি জিজ্ঞেস করল কিভাবে? উত্তরে সে বলল, আমরা 'মা' শব্দটি আগে এনে 'মা কালি' বলি। কত বড় শয়তান! এভাবে নাকি সে কালিমা পড়ছে!

বলছিলাম যে শিয়ারা আমাদের এই কোরআন শরীফ মানে না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের এই অরিজিনাল কোরআন শরীফ কোথায়? এ ব্যাপারে তাদের থেকে দুটি উত্তর এসেছে–

সেটা তাদের ১২তম ইমামের কাছে। এখন তিনি মেঘের মাঝে অবস্থান করছেন। তবে কিয়ামতের আগ মুহূর্তে পৃথিবীতে আগমন করবেন। নাউযু বিল্লাহ।

ইরাকের মধ্যে একটি গুহা আছে যার নাম 'সুর্‌রা মান রআহু'। সেখানে তাদের ১২তম ইমাম লুকিয়ে আছেন। যখন মক্কা-মদীনাসহ পুরো শিয়াদের দখলে চলে আসবে তখন তিনি অরিজিনাল কোরআন নিয়ে বের হয়ে আসবেন।

এ জন্যই শিয়ারা প্রাণপণ (!) লড়াই করে যাচ্ছে। তারা ইরাক ও ফিলিস্তিন ধ্বংস করেছে। আর সিরিয়া তো তাদের আছেই।

যেখানে কোরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করলেই কাফের হয়ে যায়, সেখানে তারা পূর্ণ কোরআনকে অস্বীকার করে। এ ছাড়া তাদের অন্য একটি রোগ হলো, দলিল বিকৃত করে উপস্থাপন করা। সুতরাং এদেরও প্রতিহত করতে হবে। وتأويل الجاهلين মূর্খদের তাফসীরকে প্রতিহত করতে হবে।

আর জেহালতের হেড অব ডিপার্টমেন্ট হলো মিস্টার মওদুদী। তার ভক্তরা বলে, আপনারা মওদুদী সাহেবের সমালোচনা করেন, কিন্তু তার মতো এমন তাফসীর লিখতে পারবেন? আরে বোকা! জেনেশুনে এমন কাজ তো পাগলেও করবে না! কারণ কোনো

আহলে হক্ব ব্যক্তির পক্ষে এমন মনগড়া তাফসীর রচনা করা সম্ভব নয়। এ জন্য এটা এতটাই উন্নত তাফসীর (!) যে এতে নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা খুব সাবলীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেউ যদি মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর নিজের বুঝ-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি বই লিখে বাজারে ছেড়ে দেয় অথচ সে মেডিক্যাল বিষয়ে এক লাইনও পড়েনি, তো অসাধারণ বই হবে না! ডাক্তারদের সামনে পেশ করলে তারা তো অবশ্যই বলবে, বাহ্! চমৎকার বই তো। তা যত বড় বইই হোক না কেন, এর কোনো মূল্য আছে? এটা কেউ কিনবে? বরং বলবে যে লোকটা বিকারগ্রস্ত নাকি। ঠিক এমনই হলো মওদুদীর তাফসীর। তিনি তাফহীমুল কোরআনে লিখেছেন, الم যখন নাজিল হয়েছিল তখন সবাই এর অর্থ বুঝেছিল। মওদুদী সাহেবকে প্রশ্ন করা হলো, তাহলে আপনি এর অর্থ বলুন? তিনি বললেন যে পরবর্তীকালে এগুলোর পরিভাষা রহিত হয়ে গেছে। এখন আর এগুলোর অর্থ করা সম্ভব নয়। দলিল হলো, 'তখন কোনো সাহাবী এর অর্থ নবীজির কাছে জিজ্ঞেস করেননি।' সবাই বুঝলে পরবর্তীকালে এগুলোর পরিভাষা রহিত হয়ে গেল কী করে? জাহেল কাকে বলে! অতএব তার তাফসীরকেও রদ করতে হবে।

আর আমাদের যমানাতে এই وتأويل الجاهلين এর কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছে ডাক্তার জাকির নায়েক। তার সম্পর্কে আমার একটি ফাতওয়া একটি মাসিক পত্রিকাতে ছেপেছে। শুধু আমার ফাতওয়া নয়, বরং দেওবন্দ, লাক্ষ্ণৌ, লাহোর ফাতওয়া বিভাগসহ মুফতী মুহাম্মদ তৃকী উসমানীর ফাতওয়া, আরব বিশ্বের ফাতওয়া সযত্নে ছেপেছে এবং এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে সারা দুনিয়ার উলামায়ে কেরাম ডাক্তার জাকির নায়েককে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার মজলিসে বসা, তার লেকচার শোনা সম্পূর্ণ নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুত তার দাওয়াতে ইসলামের কোনো উপকার হয়নি বরং বহু মুসলমান টিভি খরিদ করেছেন। সুতরাং তাকে টিভি কোম্পানির এজেন্ট বলা যায়।

আল্লাহর শোকর অনেক কথা হয়ে গেল। আমি এখানে বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আপনারা সকলে আলেম। এসব বিষয়ে ভালোভাবে মোতালাআ করবেন। উত্তম পন্থায়, মার্জিত ভাষায়, দাওয়াতী মেজাজ নিয়ে আপনারা কাজ করবেন। মুসলমানদের মাঝে এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করবেন। কোরআন-হাদীস ভালো করে বুঝে দালিলিক আলোচনা করবেন। বিভিন্ন বিষয়ে দলিলভিত্তিক অধমেরও অনেক কিতাবাদি আছে সেগুলোও সংগ্রহে রাখবেন। ইনশাআল্লাহ, ছুম্মা ইনশাআল্লাহ। আপনারা মেহনত করলে মুসলমানগণ বিভিন্ন গোমরাহ ও বাতিল দলের কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা ও মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে বাঁচতে পারবেন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আল্লাহ সকলকে সহীহ পথ জানার এবং এর ওপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাসবীহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি : একটি দালিলিক বিশ্লেষণ

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

ইসলামে শিরক-বিদ'আত অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। পবিত্র কোরআন-হাদীসে শিরক-বিদ'আতের নির্মম পরিণতি সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে, সব নতুন বিষয়ের ওপরই বিদ'আতের ফাতওয়া লাগিয়ে দেওয়া যাবে, শিরক বলে মন্তব্য করা যাবে। বর্তমান যমানায় একটি নতুন ফিতনা দেখা দিয়েছে, তাহলো নিজের নজরিয়া-চিন্তাধারার খেলাফ হলেই সেটাকে শিরক-বিদ'আতের ফাতওয়া দেওয়া হচ্ছে। মনে হবে, একটি মহলের রীতিমতো এটিই মিশন, আসলাফ ও আকাবিরদের বিভিন্ন কাজ ও আমলকে বিদ'আত আর শিরক বলে প্রচার করা। তাদের বিভিন্ন ভালো আমলগুলোর প্রতি মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিপূর্বক আমল থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এমনকি শিরক-বিদ'আত কাকে বলে তার সামান্যতম জ্ঞানও নেই, এমন ব্যক্তি অন্যদের প্ররোচনা বা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের ফাতওয়া জারি করে দিচ্ছে।

গভীর দৃষ্টিতে দেখা হলে, এ কথা স্পষ্ট বলা যায়, ইসলামের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক-প্রাসঙ্গিক–ফুরুয়ী মাসআলা ও এসবের ইখতিলাফ সম্পর্কে সাধারণ লোকদের মাঝে ব্যাপক চর্চা এবং প্রচার-প্রসারই এখন সবচেয়ে বড় বিদ'আতে পরিণত হয়েছে। কারণ মহলবিশেষ দ্বীনের বড় কাজ মনে করেই এসব করছে। এরূপ মতানৈক্যকে সাধারণ লোকদের মাঝে তুলে ধরা দ্বীনের আসল কাজ হিসেবেই জাহির করছে তারা। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের যুগে এর কোনো নজির পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অসংখ্য মাসআলায় মতবিরোধ ছিল। কেউ যদি সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যপূর্ণ মাসাআলাগুলোকে একত্রিত করতে চায় তা একটি বিশাল বিশ্বকোষে পরিণত হবে। অথচ কেউ এসবের প্রচার-প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেনি। বরং সবাই মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন।

'তাসবীহ' যা যিকিরের সংখ্যা গণনার উন্নত বস্তু এর ওপর বিদ'আতের মোড়ক সাজানোর চেষ্টা করছে একটি মহল। হাদীস শরীফ এবং আসারে সাহাবার মনগড়া অপব্যাখ্যা করে তাসবীহ ব্যবহারকারীদের বিদ'আতী আখ্যায়িত করার প্রয়াস পাচ্ছে তারা। এই লেখাতে উক্ত বিষয়ে সামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে 'তাসবীহ' উদ্দিষ্ট কোনো বস্তু নয়। বরং এটি তাকবীর, তাহলীল ইত্যাদির গণনার একটি মাধ্যম মাত্র। যে বস্তুটি মাধ্যম হয়ে থাকে তার হুকুম হলো তা আসলের তাবে হয়ে থাকে। তাই শরয়ী নীতিমালা অনুসারে হারামের উসিলা হারাম হয়ে থাকে আর ওয়াজিবের উসিলা ওয়াজিব হয়ে থাকে। অনেক সময় যিকির বা তাহলীল গণনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ বিভিন্ন যিকির নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়ার বিশেষ গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে হাদীস শরীফে। (ওসূলুত থানভী ৪৯)

'তাসবীহ' একটি আমলের নাম। আবার তাসবীহ গণনার মাধ্যমকেও আমাদের পরিভাষায় 'তাসবীহ' বলা হয়। এখানে 'তাসবীহ' বলতে গণনার মাধ্যম বা যন্ত্রকেই বোঝানো হচ্ছে। আমলকে নয়।

তাসবীহ-সংক্রান্ত হাদীস :

হাদীসে যেমন বেশি বেশি তাসবীহ পড়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে এও বলা হয়েছে যে ইসলামের স্বর্ণযুগে তাসবীহ গণনার জন্য খেজুরের বিচি এবং কঙ্কর ব্যবহারের প্রচলন ছিল। মুসতাদরাকে হাকেমে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

حدثنا اسماعيل بن أحمد الجرجانى، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلانى، ثنا حرملة بن يحيى، نبأنا ابن وهب، أخبرنى عمروبن الحارث أن سعيد بن أبى هلال حدثه عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص عن أبيها :أنه دخل مع النبى ﷺ على إمرأة، وبين يديها نوىً أو حصى، أخبرك بما هو يسر عليك من هذا أو أفضل الخ (مستدرك على الصحيحين١/٧٣٢، رقم ٢٠٠٩ كتاب الدعاء)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় উল্লেখ করা হয়েছে–

عن أبى نضرة عن رجل من الطفاوة قال :نزلت على أبى هريرة، ومعه كيس فيه حصى أو نوى، فيقول :سبحان الله، سبحان الله، حتى إذا نفد ما فى الكيس ألقاه إلى جارية سوداء، فجمعته، ثم دفعته إليه (ابن ابى شيبه :٧٧٣٤، باب فى عقد التسبيح تحقيق محمد عوامه)

আবু নাযরা তাফাওয়ার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রা

(রা.)-এর কাছে গেলেন। তাঁর কাছে একটি বাক্সে কঙ্কর আর খেজুরের বিচি ছিল। তিনি 'সুবহানাল্লাহ'-এর যিকির করে ওইগুলো দিয়ে গণনা করছিলেন। বক্সের কঙ্কর আর খেজুর বিচি শেষ হয়ে গেলে সেগুলো একজন দাসীকে দিতেন। সে আবার সেগুলো জমা করে দিত।

আরেক হাদীসে এসেছে–

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا هاشم، وهو ابن سعيد الكوفى، حدثنى كنانة مولى صفية، قال :سمعت صفية تقول : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدى أربعة آلاف نواة، أسبح بها، فقال :لقد سبحت بهذا ألا اعلمك باكثر مما سبحت به؟ فقلت بلىٰ، علمنى، فقال :قولى، سبحان الله عدد خلقه (سنن الترمذى ٣٥٥٤ ،باب فى دعاء النبى)-

সফিয়্যা (রা.)-এর গোলাম কেনানা হযরত সফিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা.) আমার কাছে এলেন। তখন আমার সামনে চার হাজার খেজুরের বিচি ছিল। যেগুলো দ্বারা আমি তাসবীহ পড়ছিলাম। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি এগুলো দ্বারা তাসবীহ পড়ছো। তোমাকে এর চেয়ে বেশি তাসবীহওয়ালা বস্তু দেব? হযরত সফিয়্যা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, سبحان الله عدد خلقه পড়ো।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন 'হাদীসুন গরীবুন", হাদীসটি এই সূত্রেই আমার কাছে পৌঁছেছে। ইমাম হাকেম বলেন, এটি সহীহ সনদের হাদীস। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উল্লেখ করেননি। এই হাদীসের জন্য আরো ভালো সনদের শাহেদ বা সমর্থক হাদীস রয়েছে। আল্লামা যাহাবীর হাদীসটির ব্যাপারে নীরব থাকাও হাদীসটি সহীহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৭৩২, হা. ২০০৮)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে সাহাবায়ে কেরাম স্বাভাবিকভাবে কঙ্কর বা খেজুরের দানা দ্বারা তাসবীহ ও যিকিরের পরিসংখ্যান করতেন এবং বিষয়টি সচরাচরভাবে রাসূল (সা.)ও জানতেন।

ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে 'তাসবীহ' :

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাসবীহের ব্যাপারে বলেন, 'তাসবীহ' আঙুল দ্বারা গণনা করা সুন্নাত। খেজুর দানা এবং কঙ্কর দ্বারা গণনা করাও উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম সেরূপ করতেন। স্বয়ং রাসূল (সা.) উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যাকে সেরূপ করতে দেখেছেন এবং এটির প্রত্যয়নও করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও সেরূপ আমল বর্ণিত আছে।

সুতলিতে গাঁথা 'তাসবীহ' সম্পর্কে বলেন, "ভালো, অপছন্দনীয় নয়"। (মজমুউল ফাতাওয়া)

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম বলেন, আঙুলে তাসবীহ গণনা করা প্রসিদ্ধ এবং উত্তম। (আল-ওয়াবেলুস সায়ব ১/১৪৩) তিনি 'প্রচলিত' তাসবীহকে বিদ'আত ইত্যাদি বলেননি।

আল্লামা শওকানী বলেন, হযরত সা'আদ ও সফিয়্যা (রা.)-এর হাদীসের মাধ্যমে খেজুর দানা ও কঙ্কর দ্বারা তাসবীহ গণনা জায়েয প্রমাণিত হয়। কারণ এর কোনো বিপরীত কথাও নেই আবার রাসূল (সা.) হযরত সফিয়্যা (রা.)-কে এ ব্যাপারে নিষেধও করেননি। (নাইলুল আওতার ২/৩৬৬)

আল্লামা মোবারক ইমাম শাওকানী (রহ.)-এর কথা দ্বারা দলিল দিয়ে লেখেন, যিকির-আযকারের ক্ষেত্রে প্রচলিত 'তাসবীহ' ব্যবহার করা যায়। তাতে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে তিনি আল্লামা সুয়ূতী (রহ.)-এর কিতাব 'আল মিনহাতু ফীস সুবহাতি' থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/২৮৬)

সাম্প্রতিক প্রসিদ্ধ আরব আলেম আল্লামা ফাওযানও তাসবীহের ব্যাপারে জায়েযের ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি লেখেন–

ويباح استعمال السبحة ليعد به الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة (مولفات الفوزان ٢٥/٤٠)

তাসবীহ গণনার ক্ষেত্রে 'তাসবীহ' ব্যবহার করা জায়েয। তবে এর পৃথক ফজীলত আছে, এমন বিশ্বাস না করা চাই।

'তাসবীহ' ব্যবহার সম্পর্কে প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বলেন–

'রাসূল (সা.) খেজুর দানা ও কঙ্করের ঝুড়ি দেখে তাতে নিষেধ করেননি বরং এর চেয়ে উত্তম পন্থা বাতলে দিয়েছেন। যদি 'তাসবীহ' অপছন্দনীয় হতো তবে নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) সে ব্যাপারে বলে দিতেন। সুতরাং উক্ত হাদীস এবং সেরূপ অন্যান্য হাদীস থেকে বোঝা যায় যিকিরের সংখ্যা গণনার জন্য তাসবীহ ব্যবহার করা জায়েয। (আল-বাহরুর রায়েক ৪/১৫৪, রাদ্দুল মুহতার ৫/৫৪)

ফকীহ, মুহাদ্দিস, আসলাফ ও আকাবিরদের স্পষ্ট বক্তব্য এবং আমল বিবেচনায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) লেখেন 'পূর্বসূরি এবং উত্তরসূরি কারো পক্ষ থেকে তাসবীহ সম্পর্কে বিরূপ কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বরং প্রায়ই তাসবীহ ব্যবহারকে পছন্দ

করতেন।' (আলহাভী লিল ফাতওয়া ৩/৫)

ইমাম তাহতাবী (রহ.) ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) সূত্রে লেখেন, খেজুর দানা ও কঙ্কর দিয়ে তাসবীহ গণনার হাদীস বহু সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এমন কি কোনো কোনো উম্মুল মুমিনীন থেকেও বর্ণিত। এমনকি তাতে রাসূল (সা.)-এর তাকরীর তথা প্রত্যয়নও পাওয়া যায়। যিকিরের ক্ষেত্রে আঙুল সর্বাবস্থায় ভালো। যদি গণনার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তাসবীহ ব্যবহার উত্তম। (মওসূআতুল ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়্যা ১১/২৮৪)

আল্লামা মানাভী লেখেন, যিকিরের সময় হুজুরিয়ে কলব এবং জিহ্বার আমল একসাথে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে তার জন্য তাসবীহ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আর যদি তাসবীহ নিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা বা রিয়ার আশঙ্কা হয় তার জন্য তাসবীহের ব্যবহার অপছন্দনীয়। (ফয়জুল কদীর ৪/৪৬৮)

তাসবীহ ও আকাবির :

আকাবিরে সূফিয়ায়ে কেরাম তাসবীহ ব্যবহার করতেন। সূফিয়ায়ে কেরাম হলেন ওই সকল সম্মানী মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের রূহানী আভায় দুনিয়া সুশোভিত। তাই তাদের আমলকে কোনো দলিল ছাড়া বিদ'আত বলে দেওয়া ভালো কাজ হতে পারে না।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) আকাবির সূফিদের অন্যতম। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনিও তাসবীহ দিয়ে যিকির করেন? উত্তরে তিনি বলেন, طريق وصلت به الى ربى لا افارقه 'আমি এই পথেই প্রভুর নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছি, তা ছাড়তে পারি না।' (ফয়জুল কদীর ৪/৪৬৮) এও বলেছেন, শুরুতে এটি আমি ব্যবহার করেছি, শেষে তা ছাড়তে পারি না। অন্তর, জিহ্বা এবং হাত একসাথে যিকির করুক এটিই আমি পছন্দ করি। (প্রাগুক্ত)

প্রখ্যাত আবেদ আবু মুসলিম খাওলানী (রহ.)-এর হাতে তাসবীহ থাকত। তিনি তা ব্যবহার করতেন। একদা তিনি তাসবীহ হাতে শুয়ে পড়েছেন। ঘুমেও তাসবীহ তাঁর হাতে ছিল। জাগ্রত হওয়ার পর যিকির করতে করতে তাসবীহ ঘোরাতে থাকেন। (আল হাভী ২/৫)

আব্দুল্লাহ ইউনিনী (রহ.) সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তাসবীহ হাতে যিকিরে বসে গেলেন। এমতাবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করলেন। তাসবীহটা হাতেই রয়ে গেল। হাত থেকে তাসবীহটা আর পৃথক করা গেল না। (আল বিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/১১১

ফাতেম বিনতে হোসাইন ইবনে আলী (রা.)-এর সিলসিলায় উল্লেখ আছে, তিনি সুতলির মধ্যে কিছু দানা গ্রথিত করে রেখে ছিলেন, যা দ্বারা তিনি তাসবীহ পড়তেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, তাসবীহ উত্তম যিকির স্মরণ করিয়ে দেয়। (নায়লুল আওতার ২/৩৬৬)

হযরত আবু দারদা (রা.)-এর কাছে একটি সন্দুকে আজওয়া খেজুরের দানা থাকত। জোহর নামায বাদ সেগুলো বের করে তিনি তাসবীহ পড়তেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর কাছে বাক্স ভরা কঙ্কর আর খেজুরের দানা মজুদ থাকত, যা দিয়ে তিনি তাসবীহ করতেন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর কাছে তাসবীহ থাকত। তাসবীহ পড়তে পড়তে একেকটি দানা সরাতেন। তাসবীহসংক্রান্ত একটি হাদীসে মুসালসালও রয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহ.), সিররী সুকতী, জুনাইদ বাগদাদী, কুরখী, উমর মক্কী, আবুল হাসান আলী ইবনে হাসান, আন নসর আব্দুল ওয়াহহাব, আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে আলী সলমী, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আসসমরকন্দী, আবুল ফজল ইবনে নাসের প্রমুখ তাসবীহ ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। (আল হাভী লিল ফাতওয়া ৩/৫)

অধিক যিকির এবং 'তাসবীহ'-এর ব্যবহার :

হযরত আবুদ দারদা উয়াইমির (রা.) দৈনিক এক লক্ষ বার তাসবীহ আদায় করতেন। খালেদ ইবনে মে'দান ৪০ হাজার বার তাসবীহ পড়তেন। এখন বোঝার বিষয় হলো, এক লক্ষ বার বা ৪০ হাজার বার তাসবীহ আঙুলে গুনে কি সম্ভব? তাতে বোঝা যায় তাঁরা গণনার জন্য যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেন, উমর ইবনে হানী প্রতিদিন এক হাজার রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন এবং এক লক্ষ বার তাসবীহ আদায় করতেন। এদিক বিবেচনা করলেও বোঝা যায় জনাব আলবানী সাহেবের 'তাসবীহ' সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের স্থানই বা কোথায়। বরং আলবানী সাহেবের 'তাসবীহ' সম্পর্কে দলিলহীন বিদ'আতের ফাতওয়া থেকে বোঝা যায়, তিনি একটি জঘন্য বিদ'আত সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। তা হলো মুসলমানগণ অতি স্বল্প সংখ্যায় যিকির এবং তাসবীহ আদায় করুক। তার চেয়ে বেশি করার চেষ্টা না করুক। অথচ রাসূল (সা.) উম্মতকে এরূপ নির্দেশ দেননি। এই বিদ'আত সৃষ্টির জন্যই হয়তো জনাব আলবানী সাহেবকে তাসবীহ সম্পর্কে বিদ'আত ফাতওয়া দিতে বাধ্য করছে। (উসুলুত্তাহানী ৪৬)

এ কারণেই ফুতুহাতে রব্বানিয়্যাতে

উল্লেখ আছে, যদি বেশি সংখ্যায় যিকিরের ইচ্ছা হয় এবং যিকিরের সময় অন্যমনস্ক হওয়ার আশঙ্কা হয় তবে তাসবীহ ব্যবহার অতি উত্তম। (আল ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যা ১/২৫১

তাসবীহের উপকারিতা :

তাসবীহের উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাসবীহের ওপর নজর পড়লে আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ হয়। এর মাধ্যমে যিকিরের ওপর স্থায়ীভাবে অটল অবিচল থাকা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, التسبيح مَـرَكَـة الشيـطـان 'তাসবীহ হলো শয়তানের জন্য দোররাস্বরূপ'। সূফিয়ায়ে কেরামের কেউ কেউ এর নাম রেখেছেন, الـحبـل الـمـوصل 'পৌঁছিয়ে দেনেওয়ালা রজ্জু'। কেউ কেউ এর নাম রেখেছেন رابـــطة القلوب (আল হাভী ৩/৫)

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, আপনারা আল্লাহর যিকিরকে গণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চান। উত্তরে বলা হয়েছে, আমরা আল্লাহর যিকির এমন সংখ্যায় করতে চাই, যা রাসূলের পবিত্র সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) (ওয়াফাত ৯১১হি.) তাসবীহ সম্পর্কে 'আল হাভী লিল ফাতওয়া' কিতাবে অত্যন্ত দীর্ঘ এবং গবেষণালব্ধ একটি লেখা সংযোজন করেছেন। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে উক্ত কিতাব দেখতে পারেন।

তাসবীহর অপব্যবহার :

কিছু প্রবৃত্তিপূজারি লোক আছে, যারা ধর্মের আলখেল্লা পরে ইসলামের বিভিন্নভাবে ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত। বরং ধর্মকে শুধু ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তারা নিজেদের গণমানুষের সামনে ধর্মীয় পোশাকের আড়ালে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে থাকে। আর সমাজে বিদ'আত-শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটায়। সেরূপ লোকের অনেকে গলায় বিভিন্ন প্রকার হারও ব্যবহার করে। অনেকে তাসবীহও গলায় ব্যবহার করে। এরূপ তাসবীহ অপছন্দনীয় এবং গর্হিত হওয়ার ব্যাপারে বলাই বাহুল্য। মুআল্লাফাতে ফওযানে আছে, অলংকারের মতো গলায় তাসবীহ লটকানো অপছন্দনীয় এবং তা রিয়া তথা লোক দেখানো ও কৃত্রিমতার শামিল। (২৫/৪০)

হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখদের মধ্যে কখনো এরূপ প্রচলন ছিল না। কিছু লোকের ভুল ব্যবহারের কারণে পুরো তাসবীহকেই বিদ'আত বলে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমরা এই গলদ ব্যবহার থেকে নিষেধ করতে পারি, এটুকু অধিকার তো সবার আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অতি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন এবং বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২৫

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

হস্তান্তরযোগ্য বিলের (Bill of Exchange) শর্তসমূহ :

হস্তান্তরযোগ্য বিলে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ অতীব জরুরি। (১) এটা একটি হুকুমনামা আকারে হতে হবে। আবেদন বা নিবেদন আকারে হলে চলবে না। (২) এটা শর্তহীন নির্দেশনামা হতে হবে। অর্থাৎ এতে উল্লেখকৃত টাকা পরিশোধ কোনো শর্তের সাথে যুক্ত হতে পারবে না। (৩) এই নির্দেশনামা লিখিত আকারে হওয়া জরুরি। (৪) এই নির্দেশনামা এক ব্যক্তি বা পক্ষের তরফ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি বা পক্ষের নামে হওয়া চাই। যদি বিল প্রস্তুতকারী এবং যার নামে প্রস্তুত করা হবে উভয় একই ব্যক্তি হয় তাহলে এটা নির্ভরযোগ্য বিল হবে না। (৫) বিল প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। যদি প্রস্তুতকারী কোনো কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয় তাহলে অবশ্যই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। (৬) বিলের মধ্যে উল্লেখকৃত টাকার বিশেষ অংকের পরিমাণের পরিশোধ চাহিদার ওপর বা আগামীতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে বা আগামীতে নির্ধারণযোগ্য কোনো তারিখে হতে হবে। (৭) বিলের মধ্যে পরিশোধযোগ্য টাকার বিশেষ পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে অন্যথায় উক্ত বিলের আইনগত কোনো ভিত্তি থাকবে না। (৮) বিলে উল্লেখকৃত টাকা বিলে উল্লেখকৃত ব্যক্তি বা তার নির্দেশক্রমে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বাহককে আদায় করতে হবে। (تعارف زرو بینکاری مبارك علی)

হস্তান্তরযোগ্য বিলের প্রসিদ্ধ কিছু প্রকার :

উক্ত বিলকে তার ধরন হিসেবে প্রকারভেদে নিম্নোক্ত তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়। ১. স্থান বিশেষ। ২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায়। ৩. পরিশোধের সময় হিসেবে।

স্থান বিশেষে বিলের দুইটা প্রকার :

(১) আন্তদেশীয় বিল (Inland Bill) আন্তদেশীয় ব্যবসায়িক লেনদেনে যেই বিলের ব্যবহার হয়। যাতে বিলের উভয় পক্ষের সম্পর্ক একই দেশের সাথে হয় এবং উক্ত বিলের বিনিময় টাকার লেনদেনও আন্তদেশীয় হয়। (২) বৈদেশিক বিল (Foreign Bill) যাতে বিলের উভয় পক্ষে দেশীয় ব্যবসায়ী ছাড়াও বিদেশি ব্যবসায়ী অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা–বাংলাদেশের কোনো ব্যবসায়ী সিঙ্গাপুরের কোনো ব্যবসায়ীর নামে কোনো বিল তৈরি করল এবং সে উক্ত বিল পরিশোধ করাটা লিখিতভাবে গ্রহণ করে নিল। এ ধরনের বিলকে বৈদেশিক বিল বলা হবে। কেননা উক্ত বিলের পরিশোধ সিঙ্গাপুরে হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় বিলের দুইটা প্রকার :

(১) বাণিজ্যিক বিল (Commercial Bill)

যা বাণিজ্যিক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য তৈরি করা হয়। লেনদেনের জগতে অধিকাংশ সময় এমন হয় যে কোনো পণ্যের ক্রেতা উক্ত পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে নগদ আদায় করার পরিবর্তে তার নিকট থেকে আগামীতে পরিশোধের জন্য একটি বিল তৈরি করে নেয় এবং উক্ত বিলের ওপর স্বাক্ষর-সিল দ্বারা এটার প্রমাণ দেয় যে বিল প্রস্তুতকারকের উপদেশ মতে বিলে উল্লেখকৃত টাকা নির্ধারিত তারিখে পরিশোধ করবে।

(২) সহযোগিতা বিল (Accommodation Bill)

এ ধরনের বিল ব্যবসায়িক বাকি লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য নয় বরং কারো আর্থিক সহযোগিতার জন্য তৈরি করা হয়। এ ধরনের বিলের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে বিলের বাট্টাকরণের সুযোগ প্রদান করে কিছুদিনের জন্য তার আর্থিক সহযোগিতা করা।

পরিশোধের সময় হিসাবে বিল দুই প্রকার :

(১) চাহিবামাত্র বিল (On Demand Bill), যা পেশ করা বা দেখানোর পর পরিশোধযোগ্য হয়। (২) সময় বিল (Time Bill), যা ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা নির্দিষ্ট সময়ের পরে পরিশোধযোগ্য হয়। উক্ত সময় হয়তো বিল ইস্যুর তারিখ থেকে শুরু হয় অথবা বিল গ্রহণের তারিখ থেকে।

বিল তৈরির পদ্ধতি :

বিল প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির অনুসরণ অপরিহার্য, (১) রেভিনিউ টিকিট লাগানো। বিলকে আইনগত বিনিময় মাধ্যমে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুতকারককে এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের সরকারি ট্যাক্স আদায় করতে হয়, যা বিলের ওপরের কোনো এক কোনায় টিকিট আকারে লাগাতে হয়। (২) টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা। বিলের মধ্যে উল্লেখকৃত পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ সংখ্যায় ও কথায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা। ৩. তারিখ লাগানো। যেই তারিখে বিল প্রস্তুত করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা। সাধারণত বিলের ওপরে যে কোনায়

টিকিট লাগানো থাকবে এর বিপরীত কর্নারে তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়। (৪) প্রাপকের নাম। বিল যেই ব্যক্তি বা পক্ষকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হবে উক্ত ব্যক্তি বা পক্ষের নাম বিলের মূল অংশে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা। (৫) অর্থপ্রাপ্তি বিষয়ক। বিল সর্বদা একটা বিশেষ পরিমাণের অর্থপ্রাপ্তির জন্য লেখা হয়ে থাকে তাই বিলের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তি বিষয়ক বা Value Received অবশ্যই উল্লেখ থাকা চাই। (৬) বিল প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর। বিলের মধ্যে বিল প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। স্বাক্ষরবিহীন কোনো বিলের আইনগত ভিত্তি নেই। (৭) যার নামে বিল প্রস্তুত করা হবে তার নাম-ঠিকানা। বিলের শেষে প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষরের বিপরীতে যার নামে বিল প্রস্তুত করা হবে তার নাম-ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। (৮) বিল গ্রহণ করা। শুধুমাত্র বিল তৈরির পর এতে উল্লেখকৃত টাকা পরিশোধ করা কোনো ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হয় না, বরং এর জন্য জরুরি হলো যার নামে বিল প্রস্তুত করা হবে সে অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ লিখিতভাবে বিল গ্রহণ করার ডকুমেন্ট বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তা ছাড়া উক্ত বিলের আইনগত কোনো ভিত্তি থাকবে না।

বিলের বাট্টাকরণ (Discounting of Bill of Exchange) :

ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক লেনদেনের জগতে বাকিতে লেনদেনে সুযোগ-সুবিধার প্রেক্ষিতে সময় বিল সাধারণত বেশি ব্যবহার করা যায়। সময় বিলের পরিশোধের জন্য আগামীতে কোনো তারিখ নির্ধারিত থাকে। তাই বাহককে যদি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিলে উল্লিখিত টাকার প্রয়োজন হয় তখন সে বাট্টাকরণের জন্য কোনো ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। বর্তমান উন্নয়নের যুগে প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ধরনের বিলের ওপর বাট্টার সুযোগ প্রদান করে ব্যবসায়ীদেরকে আর্থিক জোগান দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। মূলত ব্যাংক উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিল ক্রয় করে এবং এর বিনিময়ে বিলে উল্লেখকৃত টাকার তুলনায় কিছু টাকা কম দেয়। বাট্টার পরিমাণ নির্ধারণ ব্যাংক সুদের রেটের ওপরই হয়ে থাকে। এ ধরনের বাট্টাকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিলের বাহকের জন্য এক প্রকারের স্বল্পমেয়াদি ঋণও বলা যেতে পারে। যার ওপর ব্যাংক বাট্টা পদ্ধতিতে অগ্রিম সুদ গ্রহণ করে থাকে।

হস্তান্তরযোগ্য বিলের শরীয় বিধান :

যদি বিল প্রস্তুতকারক প্রাপকের ঋণগ্রহীতা হয় তাহলে উক্ত হস্তান্তরযোগ্য বিল হাওয়ালা হবে। প্রস্তুতকারক মুহিল বা হাওয়ালাকারী। যার জন্য প্রস্তুত করা হবে সে মুহাল আলাইহি বা যার ওপর হাওয়ালা করা হচ্ছে এবং প্রাপক হবে মুহাল বা যাকে হাওয়ালা করা হচ্ছে। যদি প্রস্তুতকারক প্রাপকের ঋণগ্রহীতা না হয় তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত বিল হাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং এটা হবে ওয়াকালা। উল্লেখ্য, যদি বিল প্রস্তুতকারক এবং যার জন্য প্রস্তুত করা হবে উভয়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা এবং দাতার সম্পর্ক না থাকে তাহলে এটা হবে হাওয়ালা মুতলাকা বা শর্তহীন হাওয়ালা।

فى المعايير الشرعية تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة اذا كان الشخص المستفيد الذى سحبت لامره دائنا للساحب ويكون الساحب هو المحيل الذى يصدر امرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود فى تاريخ معين للمستفيد المحدد۔

اما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهى المحال عليه والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال، فان لم يكن المستفيد دائنا للساحب كان اصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص فى قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة۔

تعتبر الكمبيالة فى حال عدم وجود مديونية بين الساحب والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة۔

উক্ত বক্তব্যের সারমর্ম আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

وفى تكملة فتح الملهم: فاما البون والكمبيالة والوثائق الاخرى التى يكتب عليها مبلغ الدين منذ يوم اجراء ها فان التعامل بها حوالة صحيحة بلا ريب لان الذى اصدرها قد كتب عليها انى مدين لكل من يحملها بهذا المبلغ المعلوم فكلما سلمها حاملها الى رجل آخر، فقد احال دينه عليه، وقد وجد رضا المحيل والمحتال صريحا ورضا المحتال عليه معنى لان المحتال عليه هو الذى اجرى هذه الاوراق اول مرة وقد رضى باداء مبلغها الى كل من يحملها فرضاه عام لكل من يحملها واما تلفظ الايجاب والقبول فلا يشترط فى الحوالة بل تنعقد الحوالة بالتعاطى كما ينعقد البيع۔

অর্থাৎ, বন্ড, হস্তান্তরযোগ্য বিল এবং অন্যান্য আর্থিক ডকুমেন্টসমূহ যেগুলোর ওপর টাকার বিশেষ পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকে। ইস্যু করার দিন থেকে ওইগুলোর সাথে লেনদেন নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ হাওয়ালা। কেননা যিনি ওইগুলো ইস্যু করেন তিনি এর ওপর লেখেন যে আমি ওই সব ব্যক্তির ঋণগ্রহীতা, যার নিকট এই বিল থাকবে। সুতরাং সে ওই বিল যখন অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেয় তখন সে হাওয়ালা করে। এতে হাওয়ালাকারী এবং যাকে হাওয়ালা করা হয় উভয়ের স্পষ্টত সম্মতি পাওয়া যায় এবং যার নিকট হাওয়ালা করা হয় তার সম্মতি নৈতিকভাবে উপস্থিত থাকে।

কেননা সে ইস্যু করার সময় এ কথার ওপর সন্তুষ্ট থাকে যে সে উক্ত বিলের ওপর লিখিত টাকা ওই সব ব্যক্তিকে পরিশোধ করবে, যার নিকটই উক্ত বিল পাওয়া যাবে। তবে ইজাব-কবুলের সম্পর্ক যতটুকু রয়েছে তা হাওয়ালার মধ্যে শর্ত নয়। অর্থাৎ শাব্দিকভাবে শর্ত নয় বরং বিনিময় প্রক্রিয়া দ্বারাও হাওয়ালা সংঘটিত হয়। যেমনটা বিনিময় প্রক্রিয়া দ্বারা বাঈ সংঘটিত হয়ে যায়।

বাট্টাকরণের (Discounting) বিধান :

বর্তমান যুগের জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে এই প্রক্রিয়াটি بيع الدين من غير من عليه بأقل منه অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কাউকে ঋণ বিক্রি করা ঋণের পরিমাণের টাকার চেয়ে কম টাকায়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। ফুকাহায়ে কেরাম অন্য আরো একটি আর্থিক ডকুমেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন, যা হস্তান্তরযোগ্য বিলের সাদৃশ্য। ওই ডকুমেন্টকে 'জামুকিয়্যাহ' বলা হয় জামুকিয়্যাহর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটা ওই ডকুমেন্ট, যা বায়তুল মাল বা ওয়াকফ্ প্রশাসক এমন ব্যক্তির জন্য ইস্যু করে বায়তুল মাল বা ওয়াকফের সম্পদে যার অধিকার রয়েছে এবং এর তাৎক্ষণিক টাকার প্রয়োজন এমতাবস্থায় সে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বলে জামুকিয়্যাইতে যে টাকার পরিমাণ উল্লেখ আছে এর থেকে কিছু কম টাকা আমাকে দাও। এ ধরনের লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কেননা এটা বাঈউদ্দাইনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা হাসকফি (রহ.) সেটা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وافتى المصنف (اى صاحب تنوير الابصار) ببطلان بيع الجامكة لما فى الاشباه: بيع الدين انما يجوزمن المديون۔

وقال ابن عابدين تحته: عبارة المصنف فى فتاواه سئل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية فى بيت المال ويحتاج الى دراهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية ، فيقول له رجل: بعنى جامكيتك التى قدرها كذا بكذا انقص من حقه فى الجامكية فيقول: بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا؟ لكونه بيع الدين بنقد ، اجاب: اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح۔ قال مولانا فى فوائده: وبيع الدين لا يجوز ولو باعه المديون او وهبه۔ (الدر المختار مع رد المحتار مطلب فى بيع الجامكية)

এবং হাম্বলী মাযহাবের কিতাবে রয়েছে–

ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه لانه العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر وهو ان العطاء قسطه فى الديوان ، ولا يصح بيع رقعة به اى بالعطاء لان المقصود بيع العطاء لاهى۔

অর্থাৎ, অনুদান কবজ করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা অনুদান অনুপস্থিত তাই এতে 'গারার' রয়েছে। কেননা অনুদানের কিস্তি রেজিস্টারে এবং ডকুমেন্ট বিক্রি করা জায়েয নেই যেহেতু এখানে অনুদান বিক্রি করাই উদ্দেশ্য ডকুমেন্ট বিক্রি করা নয়।

উল্লেখ্য, হানাফী এবং হাম্বলীদের মূলনীতি অনুসারে بيع الدين من غير من عليه الدين অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ঋণ বিক্রি সর্বাবস্থায় নাজায়েয। তাই এই মাসআলা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হস্তান্তরযোগ্য বিল বাট্টাকরণ ছাড়াও বিক্রি করা জায়েয হবে না। কেননা এটাও بيع الدين من غير من عليه الدين ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ঋণ বিক্রি করার অন্তর্ভুক্ত, যা সাধারণত নাজায়েয। তবে মালেকী মাযহাবের মূলনীতি অনুসারে হস্তান্তরযোগ্য বিলের ছমন হয়তো নুকূদ না হওয়া অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য না হওয়া অথবা উক্ত বিলের ছমন বিলের মূল্যের সমান হওয়া। শাফেয়ী মাযহাবও তদ্রূপ মনে হয়। উক্ত বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, বাট্টাকরণ (Discounting) কোনো অবস্থায় কারো মতে জায়েয নয়।

এ বিষয়ে ইসলামী ফিকাহ একাডেমী জেদ্দার সিদ্ধান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ان حسم الاوراق التجارية غير جائز شرعا لانه يؤل الى ربا النسيئة المحرم (مجلة مجمع الفقه الاسلامى العدد السابع ٢/٢١٧)

হস্তান্তরযোগ্য বিল Bill of exchange-এর বাট্টাকরণ Discounting-এর শরীয়া বিকল্প

আর্থিক ডকুমেন্টের বাট্টাকরণ সর্বাবস্থায় নাজায়েয। কেননা এর ফলে রিবাননাসীআ রূপে প্রকাশ পায়, যা হারাম। তবে এ বিষয়ে মুফতী মুহাম্মদ ত্বকী উসমানী দা.বা. তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন তিনি উক্ত লেনদেনকে بيع الدين বা ঋণ বিক্রি সাব্যস্ত করেন না বরং সেটাকে হাওয়ালা সাব্যস্ত করেন তাই তিনি বলেন, বাট্টাকরণের শরয়ী দৃষ্টিকোণ হলো এই যে ঋণদাতা, যার হাতে এই বিলটি রয়েছে সে ঋণের বাট্টাকারীর দিকে হাওয়ালা করে এই ধরনের হাওয়ালা بانقص من الدين ঋণের টাকার চেয়ে কমের ওপর, যা নাজায়েয। কেননা এ ধরনের লেনদেন রিবাল ফজল বা বিনিময়সংক্রান্ত সুদ। বাট্টাকরণের উক্ত লেনদেনকে بيع الدين ঋণ বিক্রি বলা যেতে পারে না। কেননা বিক্রি এবং হাওয়ালার মধ্যে পার্থক্য হলো বিক্রির পরে ঋণদাতা দায়মুক্ত হয়ে যায় এবং ঋণের সব দায়দায়িত্ব ওই ব্যক্তির দিকে রুজু হয়ে যায়, যার নিকট থেকে ঋণ ক্রয় করা হয়। অথচ হাওয়ালার মধ্যে হাওয়ালাকারী ঋণদাতা রয়েই যায় সে দায়মুক্ত হয় না যদি ওই ব্যক্তি যাকে হাওয়ালা করা হয় সে ঋণ না পায় তাহলে সে হাওয়ালাকারীর দিকেই রুজু

করার অধিকার রাখে। বর্তমানে বাট্টাকরণ প্রক্রিয়াতে বাস্তবতা ওই রকমই। যদি বাট্টাকারী বিল না পায় তাহলে সে মূল ঋণদাতার দিকে রুজু করবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়াটা بيـــــع الدين من غير من عليه الدين ঋণগ্রহীতা ব্যতীত অন্য কারো নিকট ঋণ বিক্রি নয়। বরং حـوالة الـديـن بـانـقص من الـديـن অর্থাৎ ঋণের টাকার কমে ঋণকে হাওয়ালা করা। (اسـلام اور جـديـد معيشت تجارت ١٥٠ ve) :

এর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। তন্মধ্যে থেকে একটি পদ্ধতি এটাও হতে পারে যে ব্যবসায়ী উক্ত বিলকে বিক্রি করার পরিবর্তে ব্যাংককে নিজের ঋণ উসুল করার উকিল বানাবে এবং এর জন্য ওয়াকালা ফি নির্ধারণ করে দেবে। অতঃপর উক্ত ব্যাংক থেকে বিলের লিখিত টাকার সমপরিমাণ ঋণ নেবে। ব্যাংক উক্ত ব্যবসায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তার ঋণ উসুল করে ব্যবসায়ীকে দেওয়া ঋণের পরিবর্তে নিজের ঋণ উসুল করে নেবে। যথা–করিমের নিকট একটি বিল রয়েছে, যাতে এক লক্ষ টাকার পরিমাণ উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায় করিম ব্যাংককে উকিল বানাল যে ব্যাংক উক্ত টাকা বিল ইস্যুকারী থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে উসুল করবে। অতঃপর ব্যাংক নতুন চুক্তির ভিত্তিতে করিমকে নিরানব্বই হাজার টাকা ঋণ দিল। যখন ব্যাংক এক লক্ষ টাকা মূল ব্যক্তি থেকে উসুল করবে তখন উভয় ঋণের লেনদেন কাটাকাটি বা ক্লিয়ারিং হয়ে যাবে। ব্যাংক উক্ত টাকা থেকে নিরানব্বই হাজার টাকা নিজের ঋণ হিসেবে রেখে দেবে এবং এক হাজার টাকা ওয়াকালা ফি, হিসেবে রেখে দেবে। তবে এ ধরনের লেনদেন বৈধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া যেতে হবে।

الاول: ان يـكون كل واحد من العقدين مـنفصلا عن الآخر فلا تشترط الوكالة فـى الـقرض والقرض فى الوكالة الثانى : ان لا تكون اجرة الوكالة مرتبطة بمدة نـضـج الـكمبيالة بحيث تكون الاجرة زائدة ان كانت المدة طويلة وتكون اقل ان كانت قصيرة۔ الثالث ان لا يزال فى اجـرة الـوكـالة بسبـب الـقرض الذى اقرضه البنك فانه يكون حينئذ قرضا جر منفعه۔

অর্থাৎ–১. ঋণ এবং ওয়াকালাহ উভয় আকদ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হতে হবে। ওয়াকালা ঋণের আকদের জন্য এবং ঋণের আকদ ওয়াকালাহর জন্য শর্ত হতে পারবে না। ২. ওয়াকালা ফি Maturity-এর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। যদি সময় দীর্ঘায়িত হয় তাহলে ফি বেশি হবে, আর যদি কম হয় তাহলে ফিও কম হবে, এমন হতে পারবে না অন্যথায় সেটা كـل قرض جر منفعة এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

মুফতী মুহাম্মদ ত্বকী উসমানী দা. বা. লেখেন–

কিন্তু উপরোক্ত ফর্মুলাতে লক্ষণীয় দুটি বিষয় রয়েছে–(১) সাধারণত ওয়াকালাহ ফিকে বিলের টাকার পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করা। যদি বিলের টাকার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ওয়াকালাহ ফি বেশি হবে। আর যদি বিলের টাকার পরিমাণ কম হয় তাহলে ওয়াকালাহ ফি কম হবে। (২) ওয়াকালাহ ফিকে বিল পরিশোধের সময়ের সাথেও সম্পৃক্ত করা। যথা–বিলের Maturaty যদি অনেক দিন পরে হয় তাহলে ওয়াকালাহ ফি বেশি হবে আর যদি অল্প সময় হয় তাহলে ওয়াকালাহ ফি কম হবে। প্রশ্ন হলো, ওয়াকালাহ ফিকে বিলের টাকার পরিমাণ বা পরিশোধের সময় কমবেশ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ওয়াকালাহ ফিকে বিলের টাকার পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েয বলে মনে হয়। কারণ দালালির ফিকে মূল্যমানের সাথে সম্পৃক্ত করা মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়, তবে আল্লামা শামী (রহ.) এ ধরনের প্রক্রিয়া জায়েয হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ দালাল যদি বেশি মূল্যমানের জিনিস বিক্রি করে দেয় তাহলে অতিরিক্ত ফি নেওয়া আর যদি কম মূল্যমানের জিনিস বিক্রি করে দেয় এর ফলে কম ফি নেওয়া জায়েয। আল্লামা শামী (রহ.) এর কারণ যা পেশ করেছেন তার সারমর্ম হলো, এখানে মূল্যমান বেশি বা কম হওয়ার মধ্যে দালালের শ্রম সমান তবে ফি বা পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু শ্রম বিবেচনা করা হয় না বরং শ্রমের ধরন-মানও বিবেচনা করা হয়। কম মূল্যমানের জিনিসের দালালির মান কম এবং বেশি মূল্যমানের জিনিসের দালালির মান বেশি তাই এর ওপর ভিত্তি করে দালালের পারিশ্রমিকও কমবেশ হতে পারে। এর ওপর কিয়াস করে ওয়াকালাহ ফি-এর পরিমাণকে বিলের টাকার পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করার অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয়। তবে ওয়াকালাহ ফিকে বিল পরিশোধের সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হওয়ার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেননা এটা عيـنـه সাদৃশ্য। সুদবিহীন ঋণ নিয়ে ঋণের সময়ের হিসাব করে ওয়াকালাহ ফি উসুল করে নিল অর্থাৎ যেই সুদ ঋণের ওপর নিতে পারেনি তা ফি বৃদ্ধি করে নিয়ে নিল।

সারকথা হলো, ১. ওয়াকালাহ ফিকে বিলের টাকার পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ। ২. ওয়াকালাহ ফিকে বিলের টাকা পরিশোধের সময় Maturity-এর সাথে সম্পৃক্ত করা অবৈধ। (اسـلام اور جديد معيشت وتجارت ١٥١)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ইকবালের কবিতায় নারী

মাওলানা কাসেম শরীফ

উপমহাদেশের স্বনামধন্য কবি আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮)। একাধারে তিনি কবি, দার্শনিক, প্রবন্ধকার ও রাজনীতিবিদ। সভ্য পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে ইকবাল আলোচিত, পরিচিত ও বিদিত নাম। তিনি উর্দু সাহিত্যের কালজয়ী ও কালোত্তীর্ণ কবি। দার্শনিক ইকবাল লেখাপড়া করেছেন ইউরোপে। তবুও ইসলামী ভাবধারা লালন করে তিনি বেড়ে উঠেছেন। আল্লামা ইকবালের যৌবন কেটেছে নারী আন্দোলনের চারণভূমি ইউরোপে। সেখানে বসেও তিনি অবলোকন করেছেন ভিন্ন দৃশ্য, যে দৃশ্য ধরা পড়েনি অন্য অনেকের চোখে। শায়খ নূর মুহাম্মদের ছেলে ইকবালের ধমনিতে ঈমানের শোণিতধারা প্রবহমান ছিল। তাই নারী বিপ্লবের ক্ষিপ্ত বাতাসে ইকবাল দোলায়িত হননি। ভঙ্গুর স্লোগানের সামনে অবিনশ্বর চেতনা হারিয়ে ফেলেননি। ইকবাল নারীকে নতুনরূপে আবিষ্কার করেছেন। দার্শনিকের চোখে দেখে নারীর জীবনকে তিনি ছন্দোবদ্ধ কথামালায় উপস্থাপন করেছেন। ইকবালের নারী-দর্শন অনেকটা ইসলামী ভাবধারার কাছাকাছি।

ইকবালের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

আল্লামা ইকবাল মনে করেন, নারী যদি প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্যে প্রাগ্রসর নাও হতে পারে, মানবতার কল্যাণে কোনো কাজ নাও করতে পারে, তবুও নারী 'মা' হওয়ার কারণে শ্রদ্ধার পাত্র, সম্মান পাওয়ার যোগ্য। পৃথিবীর এমন কোনো মানুষ নেই, যার ওপর নারীর অনুগ্রহ নেই, অবদান নেই।

ইকবালের ভাষায় দেখুন :

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں
شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اسکی
کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درمکنون
مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن
اس کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون

অর্থ : পৃথিবী রঙিন নারীর অস্তিত্বে
জীবন উদ্দীপ্ত নারীর বীণাতে
সপ্তর্ষি তারার চেয়েও মর্যাদাবান
সম্মান তাঁর সিন্দুকের গুপ্তধন।
লেখেনি নারী প্লেটোর দর্শন
হাজারো প্লেটো দিয়েছে জন্ম

১৯১২ সালে ত্রিপোলির যুদ্ধে ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ সৈনিকদের পানি পান করাতে করাতে শহীদ হয়েছেন। তাঁর শোকে কাতর হয়ে ইকবাল একটি কৃসিদা লিখেছেন। কৃসিদাটি শুরু হয়েছে এভাবে :

فاطمہ ! تو ابروئے امت مرحوم ہے
ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے

অর্থ : ফাতেমা! জাতি মুগ্ধ আপনার গৌরবে
ফাতেমা! জমিন স্নিগ্ধ আপনার সৌরভে।

ইকবাল মনে করেন, নারীকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। নারী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরং জাতির ভাগ্যলিপি লেখা থাকে নারীর কপালে। সন্তানের ভাগ্য লেখা থাকে নারীর ললাটে। ইকবালের ভাষায়,

چہ پیش آید چہ پیش افتاد اورا
تواں دید از جبین امہاتش

অর্থ : শিশুর অতীত ভবিষ্যৎ-বর্তমান
মায়ের ললাটে রয়েছে বিদ্যমান।

আল্লামা ইকবালের মতে, পর্দার পাবন্দি করেও নারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়। নারী শিক্ষিত হলে এর দ্বারা সমাজেরই লাভ। শিক্ষিত জাতি গঠনে শিক্ষিত নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলে বদলে যেতে পারে সমাজ। রাতের আঁধার ভেদ করে প্রভাতের আলো উদিত হতে পারে। ঘরে কোরআন চর্চার বদৌলতে বদলে যেতে পারে ওমর (রা.)-এর মতো লোকদের ভাগ্য। ইকবালের ভাষায় :

زشام ما بروں آور سحر را
بہ قرآن باز خواں اہل نظر را
تو می دانی کہ سوز قرأت تو
دگرگوں کرد تقدیر عمرؓ را

অর্থ : কোরআন পড়ে দিন-রাত
নারী আনে রাঙ্গা প্রভাত।
বোনের কণ্ঠে কোরআন শুনে
খলিফা ওমর ঈমান আনে।

তবে যে শিক্ষাব্যবস্থা নারীত্বের ধার ধারে না, মাতৃত্বের মূল্য অনুধাবন করে না, ইকবাল মনে করেন, সে শিক্ষার প্রাণ নেই, প্রভাব নেই। সে শিক্ষাব্যবস্থায় মানবতার অপমৃত্যু ঘটে। তাঁরই ভাষায় শুনুন :

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت
بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسۂ زن

ہے عشق ومحبت کیلئے علم وہنر موت

যে জ্ঞানের প্রভাবে হারায় নারীত্ব
সে তো জ্ঞান নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু
নারীর শিক্ষা যদি হয় ধর্মহীন
প্রেম-প্রণয়-জ্ঞান সবই প্রাণহীন

মাতৃত্ব ও নারী

মরহুম ইকবাল মনে করেন, নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো আদর্শ মা হওয়া। মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীত্ব পূর্ণতা লাভ করে। ইকবাল মনে করেন, মায়েরা হলেন পৃথিবীর ভিত্তিস্বরূপ। তাঁরা 'মা' না হলে বংশ বাড়বে না। সমাজ চলবে না। পৃথিবী থমকে যাবে। শত কোলাহল-উত্তাপ থেমে যাবে। সভ্যতার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই মায়েরা হলেন পবিত্র আমানত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইকবাল বলছেন :

جہاں را محکمی از امہات است
نہاد شاں امین ممکنات است
اگر ایں نکتہ را قومے نداند
نظام کاروبارش بے ثبات ست

অর্থ : জগতের ভিত হলো মায়ের জাতি
দুনিয়ায় তারা আমানত-শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।
এ রহস্য যাদের জানা নেই
সে জাতির কোনো স্থিতি নেই।

ইকবাল মনে করেন, মাতৃত্বের প্রেরণা যদি নারীর মধ্যে অবিচল থাকে; তাতে সন্তানের কল্যাণ, পরিবারের কল্যাণ, পৃথিবীর কল্যাণ। যে সমাজে নারীরা মা হতে চায় না, মাতৃত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় না, সে সমাজে শান্তি থাকে না। সুখ থাকে না। ঐক্য থাকে না। ছোট-বড়র পার্থক্য থাকে না। সুখের শেষ আশ্রয়স্থল পরিবার হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ নরক। যে সমাজ মা হতে উৎসাহী করে না, মাতৃকুলের মর্যাদা রক্ষা করে না, সে সমাজে নারী ভোগের পণ্য, জৈবিক চাহিদা পূরণের উপকরণ। যৌবন ফুরিয়ে গেলে, জৌলুস হারিয়ে গেলে নারী অর্থহীন, বিত্তহীন, মূল্যহীন। নীরবে-নিভৃতে তার সময় কাটে। অনাহারে-অর্ধাহারে তার দিন কাটে। কেউ তাকে চেনে না। কেউ তাকে দেখে না। বৃদ্ধাশ্রমে তার ঠাঁই মেলে। এ চিত্র আধুনিক যুগের। এ দৃশ্য পশ্চিমা সভ্যতার, পশ্চিমের দেশগুলোর। এ চিত্র ইকবাল সচক্ষে অবলোকন করেছেন। যে সমাজের বীভৎস রূপ ইকবাল সন্ধানী চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন, সে সমাজের স্বরূপ ইকবাল এভাবে তুলে ধরেছেন :

تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومّت
ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت

অর্থ : পশ্চিমা দুনিয়ায় মায়েদের মূল্য নেই
তাই তো তাদের সমাজে প্রাণ নেই।

কেবল সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমেই মায়েরা দায়মুক্ত হয়ে যান না, ভারমুক্ত হয়ে যান না। শিশুর সুন্দর বেড়ে ওঠা, তার ভাষা শেখা, চরিত্র গঠন ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সন্তানের জীবনের সব উন্নতি-বিকাশ, চেতনা-সচেতনতা, চিন্তা-বিশ্বাস–সবই তার মায়ের তারবিয়াত ও দীক্ষার ফসল। মায়ের আত্মিক ভালোবাসা ও স্বচ্ছতার অবদান। ইকবাল মনে করেন, পুরনো, জীর্ণ, ঘুণেধরা সমাজ বদলে দিতে নারীরা অনেক বড় অবদান রাখতে পারে। নারীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন শক্তি, বিশ্বাস ও দরদ দিয়েছেন, সে চাইলে জাতির ধমনীতে ঈমানের জ্যোতির্ময় দীপ্তি ছড়িয়ে দিতে পারে। ইকবালের দৃষ্টিতে নবুয়তের সঙ্গে মাতৃত্বের একটা জুতসই সম্পর্ক আছে। নবীদের মতো মায়েরা উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। নবীদের মতো মায়েরাও জাতির চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারেন। ইকবালের জবানিতেই দেখুন :

سیرت فرزند از امہات
جوہر صدق وصفا از امہات
نیک اگر بینی اموت رحمت است
زانکہ اورا با نبوت نسبت ست
شفقت او شفقت پیغمبر ست
سیرت اقوام را صورت گرست

অর্থ : মায়েরা করে থাকেন চরিত্র গঠন
সত্য-সুন্দর মণি-মুক্তার মতন।
আদর্শ মা জাতির জন্য রহমত
নবুয়তের সঙ্গে আছে তাঁর নিসবত।
স্নেহ-মমতায় তাঁরা নবীদের মতন
যতন করে জীবন করে গঠন।

মায়েরা হলেন শিশুর প্রথম বিদ্যাপীঠ। সন্তানরা ভাষা থেকে শুরু করে সুন্দর জীবনের দিশা পায় মায়ের কাছ থেকেই। কোরআনের আলোকে জানা যায়, হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্র। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল মা হাজেরা (আ.)-এর। ইকবাল বলছেন :

وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی

অর্থ : মায়ের জাতি শিশুর প্রথম প্রতিষ্ঠান
যেখানে পেল ইসমাঈল জীবনের দর্শন।

ইকবাল কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি, বাস্তব জীবনেও তিনি তাঁর দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সন্তানকে শিখিয়েছেন মায়ের মর্যাদা। স্বীকৃতি দিয়েছেন মায়ের ভূমিকার। ইকবাল তাঁর পুত্র জাবিদকে লক্ষ করে লিখেছেন 'জাবিদ নামা'। সেখানে রয়েছে :

مادرت درس نخستیں باتودار

غنچہ تو از نسیم او کشاد
از نسیم او ترا ایں رنگ و بوست
اے متاع ماہہاے تو ازدست

অর্থ : মা থেকেই করেছ জ্ঞান আহরণ
তোমার বিকাশে রয়েছে তাঁর সমীরণ।
তাঁর কারণেই পেয়েছ জীবনের স্বাদ
তুমি হলে মোদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ইকবালের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক

নারী আর পুরুষ নিয়েই সমাজ। নারী ও পুরুষ সমাজের দুটি চাকার ন্যায়। তারা একে অন্যের পরিপূরক। তাদের মধ্যে বৈরিতা নেই, আছে বন্ধুত্ব। তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই ইকবাল মনে করেন, অধিকারের লড়াই এখানে অর্থহীন। বরং সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে এ সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে হবে। এতেই স্বপ্ন-সুন্দর পৃথিবী গড়ে উঠবে। তাঁর ভাষায় :

مرد و زن وابستۂ یک دیگراند
کائنات شوق را صورت گراند

অর্থ : নারী-পুরুষের মেলবন্ধন
স্বপ্নগুলো করে বাস্তবায়ন।

যৌথ কায়কারবারে কোনো অবস্থাতেই সমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কেউ আমির, কেউ মামুর, কেউ নেতা, কেউ অধীনস্ত এভাবেই দেশ চলে, সমাজ চলে, পরিবার চলে। কাউকে না কাউকে বলতেই হবে। অন্যদের তা মানতেই হবে। একাধিক পুরুষ মিলে যখন কোনো কাজ করা হয়, তখনো এই নিয়ম। নারী-পুরুষ মিলে যখন কোনো কাজ করা হয়, তখনো এই নিয়ম। পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ স্বাধীন কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, মিলেমিশে কাজ করা যায়। একে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করা যায়। ভাগ করে কাজ করা যায়। এতে কাজ সুন্দর হয়। আর দেখা যায়, নারীর মধ্যে কোমলতা, স্নেহপরায়ণতা ও আবেগপ্রবণতা কাজ করে। এটা তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে পুরুষের স্বভাবে আছে গাম্ভীর্য, রূঢ়তা ও ধৈর্যশীলতা। নারী-পুরুষের জীবনধারার এ পার্থক্য ইকবালের চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই ইকবাল মনে করেন, নারীর কর্মক্ষেত্র আলাদা। পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা। নারী ঘরের দিকটা সামাল দেবে। স্নেহের পরশ বুলিয়ে সন্তানের সুন্দর আগামী গড়ে তুলবে। আর পুরুষ ঘরের বাইরের দিকটা দেখবে। স্ত্রী-সন্তানের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই ঘরে কাজ করার এই 'অধীনতা', বাইরে কাজ করার 'স্বাধীনতা'। ইকবালের ভাষায় :

جوہر مردعیاں ہوتاہے بے منت غیر
غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود

অর্থ : নারীর জীবন ধারা অন্যের অধীন
এ ক্ষেত্রে পুরুষ যদিও কিছুটা স্বাধীন।

ইকবালের দৃষ্টিতে নারী স্বাধীনতা

অব্যাহত জুলুম, নির্যাতন ও নির্দয় আচরণের ফলে পশ্চিমা নারীরা একসময় প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তারা জালিমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তা ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি পুরুষ নিহত হওয়ায় জীবিকার তাগিদে পশ্চিমা নারীরা ঘর থেকে বের হতে বাধ্য হয়। একে একে অন্যরাও স্বামী-সংসার বিমুখ হয়। চতুর লোকেরা এর নাম দিয়েছে 'নারী স্বাধীনতা'। ফলে একজন পুরুষের অধীনতামুক্ত হয়ে পশ্চিমা নারীরা অগণিত পুরুষের অধীনতাকেই 'স্বাধীনতা' জ্ঞান করতে শুরু করে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে সেই 'নারী স্বাধীনতা' ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। ইকবাল সে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। তিনি মনে করেন, পৃথিবীর একেক লোক একেক কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সবাই একমুখী হলে জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাবে। সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরুষকে ঘর থেকে বের হতে হবে। নারীরাই পারবে ঘরের কর্মযজ্ঞ যথাযথ সম্পাদন করতে। ইকবাল মনে করেন, নারী ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্র গ্রহণ করলে পরিবার তো ধ্বংস হবেই, নারীর নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়বে। পুরুষের সাহায্য ছাড়া নারী কোনো দিনই তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না।

বিষয়টাকে ইকবাল এভাবে বলেছেন :

اک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور
کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد
نے پردہ ، نے تعلیم نئی ہو کہ پرانی
نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد
جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا
اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد

অর্থ : এক গোপন ভেদ আমার বুকে লুক্কায়িত
বুঝবে কি ওরা, শীতল যাদের রক্ত?
পর্দা, শিক্ষা আর নয় তো বয়সের আবরণ
পুরুষই করতে পারে নারী জাতির তত্ত্বাবধান।
যে জাতি এ সত্য বুঝতে পারেনি
সে জাতি উন্নতি করতে পারেনি।

পশ্চিমা দুনিয়ায় এখন পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। পরিবার তাদের কাছে সাময়িক অবকাশ যাপনের স্থান

মাত্র। বহুগামিতা, লিভ টুগেদার ও ওপেন সেক্সের সুবিধা থাকায় স্বামী গ্রহণ, বিয়েশাদি তাদের কাছে অর্থহীন। পুরুষ বেচারা সেখানে ভারমুক্ত। নারীরা বন্ধনমুক্ত। ইকবাল প্রশ্ন তোলেন, এরই নাম কি প্রগতি? এরই নাম কি স্বাধীনতা? এ বিষয়ে ইকবালের বক্তব্য হলো :

کوئی پوچھے حکیم یورپ سے
ہند و یونان ہیں جس کے حلقہ بگوش
کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟
مردبے کار وزن تہی آغوش

অর্থ : ইউরোপের পণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হলো
গ্রিস-ভারতের লোকও সেখানে ছিল।
এরই নাম কি সমাজ উন্নয়ন
গ্রহণ করে নারী অন্যের আলিঙ্গন?

পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়?

যে সময় আমরা অতিক্রম করছি, কেন যেন পর্দার বিরুদ্ধে আঘোষিত যুদ্ধ চলছে। বস্ত্রহীনতার প্রতিযোগিতা চলছে। সব কিছু অবমুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে সব কিছু হয়ে পড়ছে রহস্যহীন, আকর্ষণহীন। তাই আকর্ষণের জন্য এখন কৃত্রিম সব প্রসাধনী ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইকবালের ভাষ্য হলো :

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا
سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا

অর্থ : বেপর্দার যুগ এলো, সবই এখন উন্মুক্ত
যত সব গোপন ভেদ, সবই এখন উন্মোচিত।

ইকবাল মনে করেন, যারা পর্দা প্রথা তুলে দিতে চায়, তারা নারী জাতিকে অপমান করেছে। তারা নারীর ব্যক্তিত্ব, তার সম্মান উপলব্ধি করতে পারেনি। এদের স্লোগান মুখরোচক, শ্রুতিমধুর হলেও তাদের উদ্দেশ্য দুরভিসন্ধিমূলক। পর্দার আবরণ সরিয়ে তারা অবাধ ভোগের পথ প্রশস্ত করতে চায়। কোনো রাখঢাক না করেই ইকবাল বলেছেন :

رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے
روشن ہے نگاہ، آئینہ دل ہے مکدر
بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے
ہوجاتا ہے افکار پراگندہ وابتر
خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن
خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر

অর্থ : বেপর্দার বাসনা নারীকে করেছে লাঞ্ছিত
দেখতে সুন্দর, অন্তর হলো অপবিত্র।
দৃষ্টি যখন সীমানা ছাড়িয়ে যায়
চিন্তা তখন এলোমেলো হয়ে যায়।
পর্দায় ফুটে ওঠে নারীর ব্যক্তিত্ব
এখন তো ঘর-দরজাও উন্মুক্ত!

প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি নারীরা ঘর থেকে বের হতে পারবে না? প্রয়োজনে ঘরের বাইরে কাজ করতে পারবে না? ইকবাল মনে করেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। তাই প্রয়োজনে নারী ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে ঘর নারীর সবচেয়ে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র। এখনো অনেক আদম সন্তান পর্দা মেনে চলে। তাদের জীবন পিছিয়ে পড়ছে না। তাদের জীবন রহস্যাবৃত। তাই তারা সবার শ্রদ্ধার পাত্র। ইকবাল বলেন :

بہت رنگ بدلے سپہر بریں نے
خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے
تفاوت نہ دیکھا زن وشومیں میں نے
وہ خلوت نشیں ہے یہ جلوت نشیں ہے
ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم
کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے

অর্থ : বিশাল আকাশের রং পাল্টে গেছে
দুনিয়াটা এখনো আগের মতোই আছে।
নর-নারীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়
কেউ ঘরে, কেউ রিজিকের অন্বেষায়।
যেসব মানুষ করে পর্দার সংরক্ষণ
তাদের ব্যক্তিত্ব এখনো হয়নি দৃশ্যমান।

ইকবালের দৃষ্টিতে আদর্শ নারী

ইকবাল মনে করেন, পৃথিবীতে বহু মহীয়সী মুসলিম নারী থাকলেও হযরত ফাতেমা (রা.) আদর্শ নারী। তাঁর বিয়ে, বিবাহিত জীবন, মৃত্যু–সবই নারীদের জন্য উত্তম আদর্শ। কখনো তিনি কোরআন পড়ছেন, কখনো খাবার সংগ্রহে চাক্কি ঘোরাচ্ছেন। সব কাজ তিনি সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল বলেন :

مزرع تسلیم را حاصل بتولؓ
مادراں را اسوۂ کامل بتولؓ
فطرت تو جذبہ ہا دارد بلند
چشم ہوش از اسوۂ زہراؓ بلند

অর্থ : হযরত ফাতেমা আনুগত্যের উৎস নারীদের জন্য তিনি আদর্শ।
জন্ম থেকেই তিনি আদর্শবান
তাঁর আদর্শেই বাড়ে আত্মসম্মান।

পরিশেষে ইকবাল মনে করেন, সব আইন-আদালত, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নারী নির্যাতনের চিত্র দেখা যায়। বিষয়টি তাঁকে ব্যথাকাতর করে। তথাপি তাঁর মতে, ইসলামী জীবনব্যবস্থাই নারীর জন্য সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ গাইডলাইন। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। ইকবাল বলেন,

میں بھی مظلوم نسواں سے غمناک بہت
نہیں ممکن مگر اس عہدۂ شکل کی کشود

অর্থ : আমিও নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়াতে চাই।
ইসলাম ছাড়া অন্য পথ খোলা নাই।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : পর্দা

সালমান উদ্দীন।

জিজ্ঞাসা :

আমার জন্মের দুই মাস পর আমার জন্মদাত্রী মা তাঁর নিঃসন্তান আপন মামার কাছে আমাকে পালক দেন। আমাকে গ্রহণ করার পর আমার পালক বাবার এবং পালক মায়ের উভয়ের আপন বোনের দুধ আমাকে পান করানো হয়। বর্তমানে যে সমস্যা তা হলো, আমি যদি বিবাহ করি তবে আমার স্ত্রী আমার বর্তমান পালক পিতার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে কি না। উনাদের মধ্যে পর্দা ফরজ কি না, তা কোরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান পেলে খুব কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

ইসলাম পালক ছেলেকে সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয়নি। আর আপনি পালক বাবা-মা উভয়ের আপন বোনের দুধ পান করার দ্বারা আপনি তাঁদের মাহরাম হয়ে গেলেও আপনার স্ত্রী আপনার পালক বাবার মাহরাম হয়ে যায়নি। বিধায় তাঁদের উভয়ের মাঝে পর্দা করা ফরজ। একে-অপরের সাথে পর্দা ছাড়া দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে না। (সূরা নিসা-২৩, সূরা আহযাব-৪, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৩০৩)

প্রসঙ্গ : ভিসা বিক্রয়

মুফতী শহীদুল্লাহ
প্রধান মুফতী জামিয়া দারুল
আরকাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

কোনো প্রবাসী লোককে তার মালিক একটি ফ্রি ভিসা দিয়ে বলল, তুমি তোমার দেশ থেকে একজন লোক নিয়ে এসো, প্রবাসী ব্যক্তি ভিসার বিনিময়ে তার দেশীয় লোক থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করল। এখন জানার বিষয় হলো, প্রবাসী ব্যক্তির জন্য উক্ত টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

মালিকের সম্মতি থাকলে প্রবাসী ব্যক্তির জন্য উক্ত টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে। অন্যথায় শুধুমাত্র তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার-৬/৬৩, ফাতওয়ায়ে কাযিখাঁ-৩/২০, বুখারী শরীফ-১/৩০৩)

প্রসঙ্গ : হালাল-হারাম

মুহা. মনিরুজ্জামান
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

১। জনৈক ব্যক্তি তার কোনো এক বন্ধুর সাথে কোনো বিষয়ে মনোমালিন্য হওয়ার পর কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় এবং সে আশঙ্কা করে যে যদি তার সাথে কথা বলে তাহলে তার মধ্যে অহংকার এসে যাবে। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য ওই বন্ধুটির সাথে তিন দিনের বেশি কথা পরিহার করা বৈধ হবে কি না?

২। কোনো মুসলেহ তার শিষ্যের সাথে এসলাহের নিয়্যাতে তিন দিনের অধিক কথা বন্ধ রাখতে পারবে কি না?

সমাধান :

শরয়ী দলিলের আলোকে প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির জন্য তার বন্ধুর সহিত তিন দিনের বেশি এই ধারণা করে কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয় যে তার মধ্যে অহংকার এসে যাবে বরং এটি একটি কু-ধারণা মাত্র। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মুসলেহ যদি কথা বন্ধ রাখার দ্বারা তার শিষ্যের সংশোধন হবে মনে করেন তবে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা জায়েয। (বুখারী শরীফ-৭/১১৯, উমদাতুল কারী-২২/১৪১, মাআ'লিমুস সুনান-৪/১১৪)

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা. হোসাইন আহমেদ
আই-ব্লক, বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার বর্তমানে যে আয় আছে তা দিয়ে আমার সংসার কোনোমতে কেটে যায়। বর্তমানে আমি হজে যেতে ইচ্ছুক। আমার বসুন্ধরার আই-ব্লকে একটি প্লট আছে। তা আমি ডেভেলপেমেন্ট কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছি। ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি আমাকে বাড়ির ৫০% সুবিধা দেবে এবং কিছু সাইনিং মানি দিয়েছে। উক্ত সাইনিং মানি গ্রহণ ও তা দিয়ে হজ করা বৈধ বা সঠিক হবে কি না?

সমাধান :

যেহেতু সাইনিং মানি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিকে দেওয়া জমির অংশের বা পজিশনের বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত। এমতাবস্থায় ওই টাকা দিয়ে হজ করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার আলা রদ্দিল মুহতার-৪/৫২৮, হিদায়াহ-৩/২০, আল ফিকহুল হানফী-৪/১৪)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুছা. শাকিলা জাহান
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি মুছা. শাকিলা জাহানকে আমার স্বামী মুহা. আরিফুল হক আমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঝগড়ার একপর্যায়ে (২ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলার) উপস্থিতিতে বলে যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি এক তালাক, দুই তালাক। উল্লেখ্য, তিন তালাক শব্দটি বলার আগেই আমার শাশুড়ি তার মুখ

চেপে ধরে। সে মুখ চাপা অবস্থায় বলার চেষ্টা করে। তার মুখ থেকে অ-অ শব্দ বের হয় কিন্তু সে তিন তালাক শব্দটি বলতে পেরেছে কি না উপস্থিত কেউ স্পষ্ট শুনতে পারেনি। পরবর্তীতে পারিবারিকভাবে একটা সালিস হয়। সেখানে সে আমাকে নিয়ে সংসার করতেও সম্মতি জানায় এবং তালাকের কথা স্বীকার করে যে তিন তালাক স্পষ্টভাবে বলতে পারিনি। এমতাবস্থায় আমি তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাব কি না? আমি আমার স্বামী আরিফুল হকের সংসারে স্ত্রী হিসেবে যেতে পারব কি না? পারলে কী পদ্ধতিতে–বিস্তারিত দলিল-প্রমাণসহ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

তালাক আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি অপছন্দনীয় কাজ এবং সামাজিকভাবেও তা ঘৃণিত। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীয়তে তালাকের বিধান রাখা হয়েছে। কথায় কথায় তালাক বা একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তথাপি কেউ নিজ স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিন তালাক উচ্চারণ করলে তা সাথে সাথে কার্যকর হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। প্রশ্নের বিবরণ মতে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম বলার দ্বারা এক তালাক এবং পরবর্তী এক তালাক, দুই তালাক বলার দ্বারা আরো দুই তালাক পতিত হয়ে মোট তিন তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আপনি সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছেন। শরয়ী হীলা ছাড়া ভবিষ্যতে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো অবকাশ নেই। যার সঠিক পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতী সাহেব থেকে মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। (সূরা বাকারা-৩৩০, আবু দাউদ-১/২১৭৮, রদ্দুল মুহতার-৩/৩০৬)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মাও. ওবাইদুল ইসলাম
গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

প্রশ্ন-১ (ক) আমার ব্যাংকঋণ ১২ কোটি টাকা, যা ৮ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি (খ) আমার মার্কেটের দোকানদারদের থেকে নেওয়া জামানত ১৬ কোটি টাকা, যা ৩ বছর মেয়াদি ফেরতযোগ্য। (গ) আমার গার্মেন্টস থেকে অ্যাডভান্স নেওয়া আছে ২ কোটি আশি লাখ টাকা। * ব্যাংক লোন ও দোকানদারদের থেকে নেওয়া টাকা পুরোটাই আমি মার্কেট নির্মাণ, বাড়ি নির্মাণ ও জমি ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছি।

প্রশ্ন-২. (ক) আমার প্রতি মাসে গার্মেন্টস ভাড়া বাবদ আয় ১৬ লাখ টাকা। (খ) আমার মার্কেট ও বাড়ি ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে আয় ৩৩ লাখ টাকা। (গ) আমার প্রতি মাসে ব্যাংকের কিস্তি দিতে হয় ১৯ লাখ টাকা। * বছর শেষে আমার এক-দুই কোটি টাকা ব্যাংকে জমা থাকে। এমতাবস্থায় আমার জমা টাকার ওপর যাকাত আসবে কি না?

সমাধান :

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিজের ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য নেওয়া ঋণ যাকাতযোগ্য মাল থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নেওয়া ঋণ মোট সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া যাবে কি না? এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য থাকলেও বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ঋণ হতে যে পরিমাণ টাকা যাকাতযোগ্য আসবাবপত্রে ব্যয় হয়েছে, সেই পরিমাণ টাকা তার মোট সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে। আর ঋণের যে পরিমাণ টাকা যাকাতযোগ্য আসবাবপত্রে ব্যয় না হয়ে জমি বা দালান নির্মাণে ব্যয় হয়েছে, সেই পরিমাণ টাকা তার মোট সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে না। উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী বছরান্তে আপনার কাছে যে টাকা জমা থাকে তার পুরোটাই যাকাতযোগ্য মাল হিসেবে গণ্য হয়ে তার যাকাত আদায় করতে হবে। ব্যাংক লোন বা দোকানদারদের পাওনা সেখান থেকে কর্তন করে যাকাত মওকুফ মনে করা যাবে না। (ফিকহী মাকালাত-৩/১৫৫-১৫৬, জাওয়াহেরুল ফিকহ-৭/১৯-২০)

প্রসঙ্গ : এশরাকের নামায

মির্জা জাকির হোসাইন।

জিজ্ঞাসা :

১। মসজিদে ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার পর মসজিদের বাহিরে কোনো কাজ সেরে পুনরায় মসজিদে এসে এশরাকের নামায পড়লে এশরাকের পূর্ণ সাওয়াব পাব কি?

২। মসজিদে ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার পর নিজ গৃহে গিয়ে এশরাকের নামায পড়লে তা আদায় হবে কি? যদি আদায় হয় পূর্ণ ফজীলত পাব কি?

৩। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার পর নিজ গৃহে অথবা অন্য স্থানে এশরাকের নামায পড়েছেন কি?

সমাধান :

বিনা ওজরে ফজরের নামাযের পর মসজিদ ত্যাগ করে পরবর্তীতে এশরাক আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে, তবে হাদীসে বর্ণিত এশরাকের নির্দিষ্ট ফজীলত পাওয়া যাবে না। ওই সাওয়াব পেতে হলে সূর্যোদয়ের পর অন্তত দশ মিনিট পর্যন্ত মসজিদে অপেক্ষা করে এশরাক পড়তে হবে। উল্লেখ্য, রাসূল (সা.) সাধারণ অবস্থায় ফজরের নামাযের পর যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং এশরাক পড়েই মসজিদ থেকে বের হতেন। (মুসলিম শরীফ-১/২৩৫, মিশকাত শরীফ-১/৮৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৮/১৩৪)

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্মরণে

ইলমে ফিকহ চর্চার পথিকৃৎ এক মুজাদ্দিদ

মুফতী শরীফুল আজম

বাংলাদেশে ইলমে ফিকহ নিয়ে উচ্চ গবেষণামূলক পড়ালেখার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (রহ.)। আল্লাহ পাক তাঁর কবরকে নূরে নূরে ভরে দিন। একটি সময় ছিল, যখন দাওরা পাস করার পর নিয়মতান্ত্রিক পাঠ-পাঠনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এর জন্য কোনো সিলেবাস বা প্রতিষ্ঠানের তো প্রশ্নই আসে না। এর কারণ যাই হোক, সেটা আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। দাওরা পাস করাই ছিল তৎকালীন দেওবন্দী মাদরাসার সর্বোচ্চ সনদ। এ ধারার মাঝে সর্বপ্রথম ছেদ ঘটায় মাদারে উলূম আযহারে হিন্দ দারুল উলূম দেওবন্দ। যুগান্তকারী সব সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারঙ্গম দারুল উলূম দেওবন্দ। দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণদের মধ্য হতে বাছাইকৃত কতেক মেধাবী আলেমকে ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে সর্বপ্রথম ১৯৫১ ইং সালে দারুল উলূম দেওবন্দে খোলা হয় উচচতর ফিকহ গবেষণা বিভাগ "শোবায়ে ফিকহ"। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি সাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নেওয়ার পর দারুল উলূম দেওবন্দের অনুকরণে সর্বপ্রথম এ দেশে উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ নামে ভিন্ন মেহনতের দ্বার উন্মোচন করেন হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (রহ.)। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথকে মসৃণ করার এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। সর্বস্ব বিলানো ত্যাগ-তিতিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধনা-আরাধনা আর অধ্যবসায়ের বিরল উপমা। ক্ষুদ্র এ পরিসরে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে ইলমে ফিকহের ময়দানে তাঁর বিশাল খেদমতের আলোচনা যেন অথৈ সাগরে কুনো ব্যাঙের সাঁতরে বেড়ানো। তথাপি তৃষ্ণার্ত চাতকের মুখে ফোঁটা ফোঁটা পানিও অনেক সময় শান্তনার কারণ হয়ে থাকে। সে হিসেবেই মূলত কলম ধরা।

যেভাবে মাদরাসায় পদার্পণ

ইলম ও আহলে ইলমের কদরের ফলে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ এক পরিবার থেকে ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বিভিন্ন বয়ানে একটি কথা বলতেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলতেন, ইলমের কদর করলে ইলম বাড়ে। আর কদরের পদ্ধতি হলো আহলে ইলমের কদর করা। যে আহলে ইলমকে কদর করবে, সে যদি আলেম নাও হয়, তার বংশে কেউ না কেউ অবশ্যই আলেম হবে। তাজরেবায় এমনি দেখা গেছে। আহলে ইলম অপর আহলে ইলমের কদর করলে গায়রে আহলে ইলম তা শিখবে। আহলে ইলম অপর আহলে ইলমের কদর ছেড়ে দিলে গায়রে আহলে ইলমের দিল থেকে আহলে ইলমের কদর কমে যাবে। যত দিন আহলে ইলম অপর আহলে ইলমকে কদর করেছে, তত দিন গায়রে আলেমের দিলে আহলে ইলমের কদর ছিল।

এরপর হযরতওয়ালা (রহ.) নিজ পরিবারের বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, অজ্ঞ লোকও যদি আহলে ইলমের কদর করে তাহলে তাদের ঘরে আলেম পয়দা হবে। আমাদের পরিবারের সাথে ইলমের কী সম্পর্ক? জমিদারির সাথে ইলমের কী সম্পর্ক? সব ছিল জমিদার। আমার আব্বাজান পর্যন্ত ইলমের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ইলম ও আহলে ইলমের কদরের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীদের কবুল করেছেন। ছোটকালে মা ইন্তেকাল করলে আমার পিতাকে চাচারা লালন-পালন করতেন। চাচাদের ছেলেদের মক্তবে পাঠাত আর উনাকে গৃহস্থালির কাজ দেখাশোনায় লাগাতেন। কিন্তু রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী এক মৌলভী সাহেবের কাছে গিয়ে তিনি আরবী পড়তেন। এভাবে কিছুটা কোরআন তিলাওয়াত শেখেন, যা নামায শুদ্ধ হওয়ার পরিমাণ বিশুদ্ধ বলে ধরা যায়। আর কোথাও ওয়াজ-মাহফিল হলে সেখানে যেতেন। সবচেয়ে বেশি শুনতেন জিরির হুজুরের বয়ান এবং বলতেন যে জিরির হুজুরের বয়ান আমার বুঝে আসে বাকিদেরটা বুঝে আসে না। জিরির হুজুর হযরত মাওলানা আহমদ হোসাইন (রহ.) একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবনে কী করণীয়, তা বয়ান করতেন। এভাবে ইলমের তলব আর আহলে ইলমের কদরের ফলে পরবর্তীতে উনার বংশে

আলেম পয়দা হয়। (২ রমজান ১৪২৮ হিজরী বসুন্ধরা মারকাজ জামে মসজিদ) এভাবে হযরতওয়ালা (রহ.) নিজ মুখেই তাঁর ইলমের ময়দানে কবুল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা বরেন। মূলত তাঁর পিতা মরহুম চান মিয়া (রহ.)-এর দ্বীনি জযবা, উলামা ভক্তি আর কোরআন শিক্ষার কদরের বরকতেই তাঁর ঔরসে এত বড় একজন ফকীহ জন্ম লাভ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

ছোটবেলায় তিনি নাজিরহাট বড় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর জামিয়া আহলিয়া মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখান থেকে ১৯৫০ ইং সালে দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

দেওবন্দের প্রথম ব্যাচে

১৯৫০ ইং শিক্ষাবর্ষের শেষ প্রান্তে এসে শা'বান মাসে দারুল উলূম দেওবন্দে এলান দেওয়া হয় যে আগামী বছর ইলমে ফিকহের ওপর উচচতর পড়াশোনার জন্য তাখাস্সুস ফিল ফিকহ নামে নতুন একটি বিভাগ খোলা হবে। প্রাদেশিক কোটাভিত্তিক সারা দেশ থেকে মাত্র পাঁচজন ছাত্র ভর্তি করা হবে। তন্মধ্যে বঙ্গ প্রদেশ থেকে একজনের কোটা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলান দেখে হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ভর্তির দরখাস্ত দেওয়ার হিম্মত করে ফেলেন। সহপাঠী আপন বড় ভাই হযরত মাওলানা ওবায়দুর রহমান (রহ.)-এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি বললেন, গোটা বঙ্গ প্রদেশ থেকে মাত্র একজন নেওয়া হবে, সেখানে তোমার নাম কি আসবে? হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, নাম না আসলে কি আমার ইজ্জত যাবে? দরখাস্ত দিয়েই দেখি না। এভাবে তিনি দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দরখাস্ত দিলেন। আল্লাহর মদদ শামেলে হাল হলো। তাঁর অশেষ মেহেরবানিতে বাছাইয়ে তিনি টিকে গেলেন। সুগম হলো ইলমে ফিকহের ময়দানে বিচরণের পথ। হিম্মতে বান্দা মদদে খোদা বলে কথা। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হিম্মত আর মদদের এই নীতির বাস্তবায়ন চোখে পড়ার মতো ছিল। যারা তাঁকে দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখেছে, একসঙ্গে কাজ করেছে তারা অবশ্যই এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে। যেকোনো কাজের তিনি ইচ্ছা করতেন দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে তা মঞ্জুর করিয়ে নিতেন। এ ক্ষেত্রে সকলের মন্তব্য হতো, হুজুর যখন বলেছেন–এটা হয়ে যাবে। لو اقسم على الله لابره এমন অসংখ্য ঘটনা আছে, যা লিখতে গেলে আজকের আলোচ্য বিষয় রয়ে যাবে।

দু'আর প্রতি অগাধ আস্থা

সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলা যায় যে জীবনে তিনি যা কিছু পেয়েছেন, যে সকল খেদমত করেছেন একমাত্র দু'আর মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়েছিল। দু'আর প্রতি তাঁর যে আস্থা ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার পাশে অল্প একটু জায়গার নাম মুলতাযাম। হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে মুলতাযাম স্পর্শ করে যেকোনো দু'আ করা হয় তা কবুল হয়ে থাকে। আহাদীসে মুসালসালাতের পাঠদান কালে মুলতাযামের উক্ত ফজীলতের হাদীসটি যখন আসত সকল বর্ণনাকারীর মতো হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ আমিও মুলতাযাম ধরে যত দু'আ করেছি তার সবকটি কবুল হয়েছে। শুধু একটি দু'আ কুবলের অপেক্ষায় আছি।

দেওবন্দে মুঈনে মুফতী

বহুকাঙ্ক্ষিত দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া বিভাগে ভর্তির সুযোগ লাভের পর কঠোর পরিশ্রম ও মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। ইলমে ফিকহ নিয়ে তাঁর মেহনত, আগ্রহ আর সাধনা উস্তাদদের নজরে পড়ল। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তিনি ওই কোর্স সম্পন্ন করলেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে দারুল ইফতার মুঈনে মুফতী হিসেবে রেখে দিলেন। এভাবে ওই বিভাগ থেকে ফারেগ হওয়ার পর আরো কিছুদিন মণি-মুক্তা আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হলো। হযরতওয়ালা (রহ.) উস্তাদদের কাছে খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। যার কারণে দারুল ইফতার চাবি তাঁর কাছেই রাখা হতো। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি রাত-দিন দারুল ইফতার কিতাবাদি অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন। মুঈনে মুফতী থাকাকালীন গভীরভাবে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন ইলমে ফিকহ নিয়ে পরিচালিত উচ্চতর গবেষণামূলক নতুন এ বিভাগের গতি-প্রকৃতি, কর্মপন্থা ও উপকারিতা। হয়তো তখন থেকে তাঁর ভেতর প্রেরণা জেগেছিল নিজ দেশে ইলমে ফিকহের এমন মেহনত ছড়িয়ে দেওয়ার।

উস্তাদদের দু'আয় আগে বাড়া

হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ছাত্র সময় থেকেই তাঁর মাঝে অন্য দশজন থেকে আলাদা কিছু চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করত। সময়ের ব্যবধানে স্বতন্ত্র ওই মনোভাব বিশুদ্ধ বলেও প্রমাণিত হয়েছে বহুবার। এটাকেই হয়তো মুমিনের ফেরাসত বা অন্তর্দৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। কোন পাখি উড়াল দেবে বাসায় থাকতেই নাকি তা বোঝা যায়। শিক্ষকের দু'আ ছাত্রের ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়ক–এ কথা তো সকলেই জানে। কিন্তু এই বিশ্বাস যদি মনের গভীরে দাগ কেটে থাকে তবে

শিক্ষকের সাথে সদাচরণে, তাঁদের মূল্যায়নে ভিন্ন কিছু যোগ হতে পারে। এমনই ঘটেছিল হযরতওয়ালার (রহ.) ছাত্রজীবনে। দারুল উলূম দেওবন্দে যারা মুঈনে মুফতী হিসেবে খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করে, মাদরাসার পক্ষ থেকে তাদেরকে কিছু সম্মানী ভাতা প্রদানের নিয়ম আছে। হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) মুঈনে মুফতী হিসেবে যে ভাতা পেতেন তা তিনি উস্তাদগণের জন্য ব্যয় করতেন। ওই টাকায় বিরিয়ানি রান্না করে উস্তাদদের দাওয়াত করে খাওয়াতেন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী তখন হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান (রহ.)। ওই যুগে ছাত্রও মুখলিস ছিল উস্তাদও মুখলিস ছিলেন। ছাত্রের পক্ষ থেকে এমন আবেগ আর মহব্বতের দাওয়াত উস্তাদরা সাদরে গ্রহণ করতেন। উস্তাদদের কাছ থেকে দু'আ নেওয়াই ছিল একজন মুখলিস তালেবে ইলমের ব্যতিক্রমধর্মী এই আয়োজনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিতাবের অভাব হবে না

জীবনের এ সকল ঘটনা শুনিয়ে নিজ ছাত্রদের তিনি অনেক সময় উদ্বুদ্ধ করতেন। একদা বসুন্ধরা থেকে কোথাও শিক্ষক পাঠানোর প্রয়োজন হলে ছাত্রদের মধ্য হতে বাছাই হতে লাগল। আমি তখন ফিকহ সমাপনী বর্ষের ছাত্র, অল্প কয়েক দিন পর ফারেগ হব। হযরতওয়ালার (রহ.) সামনে আমাকে হাজির করা হলো। একে তো আমার অল্প বয়স আবার হালকা-পাতলা শরীর। এমন ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, দেওবন্দে থেকে কী করেছ? ভালো ভালো খেয়ে স্বাস্থ্য বানাতে পারলে না? আমি বললাম, কিতাব সংগ্রহ করেছি। দেওবন্দে থাকতে হাতে যে টাকা-পয়সা আসত তা কিতাব ক্রয়ের পেছনেই খরচ করতাম। এ কথা শুনে হযরতওয়ালা (রহ.) তাঁর নিজের ঘটনা শোনান যে আমি দেওবন্দে থাকতে টাকা দিয়ে কোনো কিতাব কিনতাম না। উস্তাদদের পেছনে খরচ করতাম। দাওয়াত করে উস্তাদদের এবং সাথিদের খাওয়াতাম। ভাবতাম, উস্তাদদের দু'আয় আমি যদি বনতে পারি তাহলে কিতাবের অভাব হবে না।

এটা ছিল হযরতওয়ালার (রহ.) সেই ছাত্রবেলার অভিব্যক্তি। পরবর্তীতে যা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। যে সকল স্থানে তিনি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, তাতে কিতাবের এমন ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে সহজে যা অধ্যয়ন করে শেষ করা যাবে না। প্রয়োজনীয় সব কিতাব তাঁর হাতের কাছে থাকত। এটা একমাত্র উস্তাদের দোয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তাঁর এমন সব অদ্ভুত ও নজিরবিহীন আচরণে উস্তাদরাও মন খুলে দু'আ করেছিলেন। এবং স্নেহস্পদ এই তালেবে ইলমের ব্যাপারে তাঁরা আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। দেওবন্দ থেকে চলে আসার সময় ঘনিয়ে এলে উস্তাদরা তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, আব্দুর রহমান তুমি ময়দান তালাশ করো। অর্থাৎ বৃহৎ আকারে খেদমতের ময়দান সন্ধান করো। তোমাকে দিয়ে দ্বীনের বড় খেদমত হবে।

পটিয়া মাদরাসায় যোগদান

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে খেদমত আরম্ভ করেন। হাটহাজারী থেকে যান দেওবন্দ আর দেওবন্দ থেকে ফেরেন পটিয়ায়। এভাবে গোটা জীবনই তিনি হয়ে থাকেন বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের প্রতীক। যেহেতু তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফুনুনাতের ওপর কোর্স করে এসেছিলেন তাই ফুনুনাতের জটিল কিতাবগুলো তাঁর নামে বণ্টন করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য কিতাব তো আছেই। তবে একটি কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ হাদীসের একটি কিতাব পাঠদানের দায়িত্ব হযরতওয়ালাকে (রহ.) প্রদান করলেন। তিনি এই বলে ওজর পেশ করেন যে চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পর নবী-রাসূলগণ (আ.) নবুওয়াত পেতেন। তাই এত অল্প বয়সে হাদীসের কিতাব পড়াতে আমার হিম্মত হয় না। এমন নজিরবিহীন বিনয়ের ফলে তিনি একসময় পটিয়াতে বুখারী শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাব পাঠদানের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর আজীবন আরব-আজমে এ সুধা বিলিয়ে যান। এমনকি আমৃত্যু বুখারী শরীফের খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

নতুন বিভাগের পথচলা

ইলম ফিকহ নিয়ে উচ্চতর গবেষণামূলক লেখাপড়ার যে ধারণা দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে তিনি পেয়েছিলেন দেশের মাটিতে তার বাস্তবায়ন ছিল সুদূরপরাহত। তৎকালীন বড় বড় সুপ্রসিদ্ধ যত মুফতী ছিলেন কেউই তো আর ফিকহ নামের ভিন্ন কোনো বিভাগ থেকে পাস করা ছিলেন না। তাই এমন কোনো বিভাগের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না, সেটাই ছিল তখন বিতর্কের বিষয়। এমন এক পরিবেশে পটিয়ার মতো পুরাতন ময়দানে নতুন কাজ আরম্ভ করা ছিল বড়ই চ্যালেঞ্জের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ পাক এই দুঃসাধ্যকে সাধনের জন্য তাঁকে পাহাড়সম হিম্মত দান করলেন। হিম্মতে বান্দা মদদে খোদার ফর্মুলা মতে কাজ হতে লাগল।

১৩৯৩ হিজরি সনের কথা। হযরতওয়ালা তখন পটিয়াতে আবু দাউদ শরীফের পাঠদান করতেন। সবক পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দাওরায়ে হাদীস

সমাপনকারী ছাত্রদের তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন ফিকহ পড়ার জন্য এক বছর সময় দিতে। বলতেন, আরেকটি বছর সময় দাও তোমাদের অনেক ফায়দা হবে। হযরতের এমন দরদমাখা পরামর্শে অনেকের দিল তৈরি হয়। বাড়িতে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অনুমতি মেলে আরেক বছর পড়ার।

সত্য বলতে কি ছাত্র তৈরি করার আজব কারিগর ছিলেন হযরতওয়ালা (রহ.)। যেকোনো নতুন কাজে ছাত্রদের লাগাতে চাইলে তিনি উৎসাহমূলক এমন সব কথা শোনাতেন, যাতে ছাত্ররা তৈরি হয়ে যেত। তাঁর কথায় ছিল মধুর আকর্ষণ। যে কেউ আকৃষ্ট হতে বাধ্য। ছাত্রদের আপন করে নেওয়ার নিপুণ দক্ষতা ছিল তাঁর। ফলে ছাত্রদের কাছে তিনি আপনজন অপেক্ষা প্রিয় হয়ে উঠতেন। নতুন বিভাগ হিসেবে উলূমে ফিকহ, উলূমে হাদীস, তাফসীর, তাজবীদ বা ইসলামী অর্থনীতি যাই বলুন না কেন, সকল নতুন মেহনত চালুর সময় একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। অর্থাৎ খুবই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তিনি ছাত্রদের সামনে প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতেন। এরপর ধীরে ধীরে পথচলা শুরু করতেন।

সারা বছরের মেহনতের ফলে সাতজন ছাত্র তৈরি হলো। ১৩৯৩ হিজরি সনে বাংলাদেশের মাটিতে এই সাতজনকে দিয়েই সর্বপ্রথম আত্তাখাস্সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী নামে নতুন বিভাগ চালু হয়। দেওবন্দে শুরু হয়েছিল পাঁচজন নিয়ে আর পটিয়াতে শুরু হলো সাতজন দিয়ে। হযরতওয়ালা (রহ.) তো যারপরনাই খুশি। তিনি বলতেন, "আমাদের নিয়ে দেওবন্দে শুরু হয়েছে আর আমি তোমাদের নিয়ে শুরু করছি।" দেওবন্দ থেকে পাওয়া সেই আমানত দীর্ঘ দুই যুগ বক্ষে ধারণ করে রাখার পর সঠিক পাত্রে পৌঁছে দেওয়া ছিল তাঁর জীবনের বিরাট এক সফলতা।

উস্তাদদের অভিব্যক্তি

ভালো কাজের সমর্থন বা উৎসাহ প্রদান অনেক বড় হৃদয়ের কাজ। নবীনদের প্রতিভা বিকাশে প্রবীণদের উদারমনা হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে এ জিনিসটির বড়ই অভাব। কেউ কাউকে আগে বাড়িয়ে দিতে আগ্রহ দেখায় না। অথচ দু-চারটি বাক্য বিনিময়ই তো। এর চেয়ে বেশি কিছু তো আর লাগে না কারো মেহনতে উৎসাহ জোগাতে। দারুল উলূম দেওবন্দে আমাদের দেশীয় ছাত্ররা সেই শুরু যুগ থেকেই ভালো ভালো রেজাল্ট করে অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষা সমাপন করে আসছে। কিন্তু দেশে এসে তারা হারিয়ে যায়। চাপা পড়ে যায় তাদের সকল প্রতিভা। অভাব শুধু এদের যথাযথ মূল্যায়ন আর উৎসাহবাচক দুটি বাক্যের।

হযরতওয়ালা (রহ.) নিশ্চয় দেশে এসে এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু স্বভাবগতভাবেই তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। কাছ থেকে যারা তাঁকে দেখেছে এ বিষয়টি তারা অবশ্যই লক্ষ করেছে। প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেও তিনি নতুন এ কাজের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পেলেন তৎকালীন পটিয়ার প্রসিদ্ধ বুজুর্গ বোয়ালবী সাহেব হুজুর (রহ.) এবং ইমাম সাহেব হুজুর (রহ.)-কে। বান্দার হিম্মতের বিপরীতে যেন আল্লাহ তা'আলার মদদ হিসেবে তাঁরা সামনে এলেন। নতুন এ বিভাগের কার্যক্রম দেখে বোয়ালবী সাহেব হুজুর (রহ.) বলেছিলেন, বহুদিন পর একটি জরুরি ফন খোলা হয়েছে। অপরদিকে ইমাম সাহেব হুজুর (রহ.) এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রসমুল মুফতী পাঠদানের ভার নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন।

হাঁটি হাঁটি-পা পা করে এগোতে লাগল সদ্য খোলা নতুন একটি বিভাগ। সকলের সমর্থন তখনো পাওয়া যায়নি। এ কাজের প্রয়োজনীয়তা আর গুরুত্ব সকলকে বোঝানোর জন্য হযরতওয়ালা (রহ.) বিভিন্ন পদ্ধতিতে মেহনত চালাতে থাকেন। এভাবে কয়েকটি মাস পার হয়ে গেল। নতুন কাজ পেয়ে ছাত্ররা খুব উৎফুল্ল। বেশ আগ্রহের সাথে তারা মেহনত করতে লাগল। একেবারে নতুন একটি বিভাগ। কিতাবাদির জোগাড় খুব একটা হয়ে ওঠেনি। তবুও ছাত্ররা চেষ্টা করে গেল। ওই ব্যাচের ছাত্র ছিলেন বর্তমান পোকখালী মাদরাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী এমদাদুল হক সাহেব (সুফি সাহেব হুজুর) দা.বা.। সেই থেকে তিনি হযরতওয়ালার (রহ.) সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে রাখেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে খুব বেশি কিতাব ছিল না। হুজুর বাড়িতে গেলে তাঁর কিতাবগুলো এনে আমরা পড়ে আবার রেখে দিতাম।

হযরতওয়ালা (রহ.) ছাত্রদেরকে জটিল জটিল বিভিন্ন মাসআলা দিয়ে তামরীন করাতেন। যেমন–এক ছাত্রকে একটি প্রশ্ন দিলেন, নবী-রাসূল ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তি আছে ঘুমালে যার অজু ভাঙে না? অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এর উত্তর বের করতে পারল না ছাত্রটি। বলল হুজুর, কোনো কিতাবে এর উত্তর খুঁজে পেলাম না। হযরতওয়ালা (রহ.) বললেন, ঠিক আছে। তাহলে এ কথাটিই অন্তত লিখে দাও। অনেক সময় ছাত্ররা এমন সব জটিল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে মাদরাসার অন্যান্য আসাতিজায়ে কেরামদের শরণাপন্ন হতো, তাঁদের সাহায্য নিত। এভাবে ওই উস্তাদের কাছে নতুন এ মেহনতের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। সমর্থনের পাল্লাও দিন দিন ভারী হয়ে চলল।

ছাত্রদের কারগুজারী

বহু মেহনত মোজাহাদা করে একটি বছর যখন ছাত্ররা পার করে দিল তখন তাদের চোখ খুলে গেল। বছর শেষে তাদের কাছ থেকে কারগুজারী শোনার জন্য উস্তাদদের সামনে তাদেরকে হাজির করা হলো। এটি ছিল হযরতওয়ালা (রহ.)-এর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কাজকে আগে বাড়ানোর চমৎকার কৌশল। ছাত্ররা নিজেদের ফায়দার কথা যখন নিজ মুখে ব্যক্ত করবে তখন তা সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এভাবে আগামীতে কাজের পথ সুগম হবে। বাস্তবে তা-ই হলো। ছাত্ররা একে একে যখন নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে লাগল উস্তাদরা তা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন। নতুন এই ফনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকলে এর প্রতি সমর্থন জানালেন। এটাকেই বলে তাজদীদকার। মুজাদ্দিদ যিনি হন তাঁর সামনে বাধা আসে কিন্তু কাজের মাধ্যমে তিনি সকলের সমর্থন আদায় করে ছাড়েন।

ওই দিনের মজলিসে উপস্থিত এক ছাত্র মুফতী এমদাদুল্লাহ সাহেব দা.বা. (সুফি সাহেব হুজুর) সেদিন নিজের সাফল্যগাথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, এই একটি বছর সময় যদি আমি না দিতাম তাহলে বিগত বারো বছরের মেহনত বৃথা যেত।

চেরাগ থেকে চেরাগে

পরের বছর ছাত্র সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল। ছাত্রদের মুখে মুখে শুধু নতুন এই ফনের আলোচনা। উত্তরোত্তর এই বিভাগের প্রতি ছাত্রদের ঝোঁক আর আগ্রহ দেখে পরবর্তীতে অন্যান্য মাদরাসায় এই ফন চালু হতে লাগল। আজ সারা দেশে তাখাস্সুস ফিল ফিকহ নামে যে মেহনত ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা হযরতওয়ালার (রহ.) জ্বালানো চেরাগেরই দ্যুতি। علم ينتفع به হিসেবে রেখে যাওয়া এই ইলমী মেহনতের সাওয়াব তিনি কেয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

রাজধানীর বুকে

দীর্ঘ তিন যুগের খেদমত জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৯০ ইং সালে তিনি পটিয়া থেকে চলে আসেন। এবার ইলমে ফিকহ নিয়ে ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা। কিন্তু এর জন্য উপযুক্ত স্থান কোনটি হবে তা নিয়ে চলতে থাকে জল্পনা-কল্পনা। অবশেষে দেশ-বিদেশের বরেণ্য আলেম-উলামা ও মুরব্বিদের পরামর্শে রাজধানী ঢাকাকেই এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হলো। বিশেষ করে হারদূয়ী হযরতও (রহ.) ঢাকাতেই ওই প্রতিষ্ঠান করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের মেহমানদের যাতায়াতের সুবিধার প্রতি লক্ষ করে বিমানবন্দর পার্শ্ববর্তী উত্তরার জসিমুদ্দিনে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। ভাড়া বাড়িতেই ১৯৯১ ইং সালে প্রতিষ্ঠা হয় আজকের জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরা। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস, যা এখানে লেখা উদ্দেশ্য নয়।

ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

প্রায় দুই যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে বসুন্ধরায় চালু করা হয় উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ। মানসম্মত গবেষণা ও নির্ভরযোগ্য তাহকীকের জন্য কী করণীয় সে সম্পর্কে হযরতওয়ালার (রহ.) গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল। গবেষণারত ছাত্রদের তৈরি করতে যা কিছু প্রয়োজন, তার সব আয়োজনই তিনি করলেন অত্যন্ত সুচারুরূপে।

কিতাবের ভাণ্ডার

কিতাবের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুললেন বসুন্ধরায়। এ দেশের বাজারে তখনো কিতাবের এত আনাগোনা হয়ে ওঠেনি, এখন যেমন দেখা যাচ্ছে। চাহিদামাফিক ইলমে ফিকহের কিতাব সংগ্রহ করতে তখন অনেক বেগ পেতে হতো। তা সত্ত্বেও ভারত, পাকিস্তান, বৈরুত, মিসর এবং মক্কা শরীফ-মদীনা শরীফ থেকে প্রয়োজনীয় কিতাব সংগ্রহ করা হলো। ইলমে ফিকহের ওপর ছাপানো কোনো কিতাব মনে হয় বাদ পড়েনি। ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে একেক কিতাবের পর্যাপ্ত কপি রাখা হলো।

কার্যকরী সিলেবাস

ছাত্রদেরকে ইলমে ফিকহের ওপর দক্ষ করে গড়ে তুলতে হযরতওয়ালা (রহ.) দুই বছরের কোর্স প্রণয়ন করেন। প্রথম বর্ষে ফিকহ, উসূলে ফিকহ, কাওয়ায়েদে ফিকহ এবং উসূলে ইফতার গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহের পাঠদান ও ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় বর্ষে তামরীন এবং মাকালা লেখানোর সিদ্ধান্ত নেন। হযরতওয়ালা (রহ.) তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলতেন, ফিকহ পড়ার জন্য এক বছর যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে। প্রথম বছর শুধু মোতালা'আ ও অধ্যয়নের পেছনে ব্যয় করতে হবে। মোতালা'আ ও ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন না হলে তামরীন আর ফাতওয়া প্রদান কষ্টকর হবে।

তামরীন

দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত ফিকহের যে সকল কিতাব পড়ানো হয় তাতে সব অধ্যায় শেষ করা হয়ে ওঠে না। হয়তো সময়ের অভাবে বা প্রচলন ও প্রয়োজন না থাকায়। যেমন কিতাবুল কাযা, হুদুদ, কেসাস, কাফালা, ওয়াকালা অথবা হাওয়ালা ইত্যাদি অধ্যায় সাধারণত পড়া হয় না। ফিকহের ছাত্রদের ওই সকল অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তামরীন ও মোতাআলার নেসাবে ফিকহের সকল অধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। তামরীনের জন্য পঞ্চাশটি অধ্যায় ধার্য করা হয়েছে। যার প্রতিটি থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক তামরীন করা আবশ্যক। প্রতিটি তামরীনে কমপক্ষে তিনজন উস্তাদের দস্তখত থাকতে হয়। দারুল ইফতার সকল কিতাব থেকে দলীল সংগ্রহ করতে জোড় তাগিদ দেওয়া হয়ে থাকে। গড়ে ২৫-৩০টি দলিল উল্লেখ থাকে। এখানে গ্রুপ তামরীনের সুযোগ নেই। একটি প্রশ্ন একাধিক ছাত্রকে দিয়ে তামরীন করানো হয় না বরং প্রত্যেকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে।

মাকালা

শেষ বর্ষের ছাত্রদের জন্য রয়েছে মাকালা। গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাসায়েলের ওপর এই প্রবন্ধ তৈরি করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট একটি বিষয়কে কোরআন-সুন্নাহ আর ফিকহে হানাফীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। এটি অনেকটা পিএইচডির থিসিসের মতো। বার্ষিক পরীক্ষায় এ বিষয়ে একশত মার্কের একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ এই মেহনতের ফলে ছাত্রদের মাঝে প্রবন্ধ/পুস্তিকা লেখার যোগ্যতা পয়দা হয়। ছাত্রদের প্রতি হযরতওয়ালার (রহ.) এটি একটি বিরাট অবদান। তিনি সর্বদা নবীনদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সচেষ্ট থাকতেন। মাকালা লেখানো তার একটি উদাহরণ মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ বহু মাকালা/থিসিস বসুন্ধরা থেকে তৈরি করা হয়েছে। যার তালিকা অনেক দীর্ঘ। উল্লেখযোগ্য দুটি থিসিস হচ্ছে, ফাতহুল ক্বাদীর এবং বাদায়েউস সানায়ের মাসায়েলের সূচি। এ দুটি ছিল গ্রুপ থিসিস। ফাতাওয়ায়ে শামীর মাসায়েলের ওপর যেমন সূচি তৈরি করা হয়েছে ফতহুল গাফ্ফার। ঠিক তারই অনুকরণে একই পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ দুই কিতাবের সূচি। ভবিষ্যতে এ সকল মাকালা ছেপে প্রকাশ করতে পারলে সকলের ফায়দা হবে নিঃসন্দেহে।

সমসাময়িক মাসায়েল চর্চা

হযরতওয়ালা (রহ.) ছিলেন যুগসচেতন একজন ফকীহ। সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সিদ্ধহস্ত। নিজের ছাত্রদেরকেও চেয়েছিলেন সেভাবে তৈরি করতে। সমসাময়িক মাসায়েলের চর্চা তাহকীক ও রপ্ত করার জন্য তিনি চমৎকার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত হজ ও কুরবানীর মৌসুম এলে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল জানতে চায়। বছরে একবার প্রয়োজন হওয়াতে এর চর্চাও খুব একটা হয় না। হলেও মনে থাকে না। তাই ফিকহের ছাত্রদের জন্য হজ-উমরাহ এবং কুরবানীর মাসায়েলবিষয়ক একটি মুবাহাসার আয়োজন করা হয়। ঈদুল আযহার ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার প্রাককালে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পনের দিন পূর্ব থেকে চলে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ছাত্রদের প্রস্তুতি। অনেকটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কোন পক্ষ কাকে হারাতে পারে। প্রথম বর্ষের ছাত্রদের বিষয় কুরবানী আর দ্বিতীয় বর্ষের জন্য হজ-উমরাহ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই বাহাসকে উপলক্ষ করে ছাত্ররা ব্যাপক অধ্যয়ন করে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, জটিল থেকে জটিল সব মাসায়েলের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা হতে থাকে। ফলে এ বিভাগের ছাত্রদের ব্যাপক ফায়দা হওয়ার পাশাপাশি বাহাসের শ্রোতা অন্য সব ছাত্রদেরও ফায়দা হয়। এমনকি হযরাত আসাতিজায়ে কেরামও ওই মজলিসে উপস্থিত থেকে ইস্তিফাদা করেন এবং ছাত্রদের উৎসাহ জোগান। এভাবে সমসাময়িক মাসায়েল সকলের সামনে চলে আসে। ইয়াদ তাজা হয়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষক বা ছাত্র-শিক্ষক পরস্পর মুযাকারার মাধ্যমে এলমকে তাজা করা হযরতওয়ালার (রহ.) অন্যতম আদর্শ। এতে লজ্জাবোধ বা ইতস্ততার কোনো কারণ নেই।

তাখরীজে আওকাত

মাদরাসাপড়ুয়াদের জন্য এটি একটি নতুন ফন। নামাযের ওয়াক্ত নিয়ে যদিও বিভিন্ন কিতাবে কমবেশি আলোচনা রয়েছে কিন্তু ডিগ্রি হিসেবে সময় নির্ণয় শেখানো হয় না। সূর্যের গতি মেপে উদয়-অস্তের জেলাভিত্তিক বরং প্রতি ডিগ্রিভিত্তিক সময় বের করার জন্য অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের দ্বারস্থ হওয়া জরুরি। বিশ্বের যেকোনো শহরের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং সাহরী-ইফতারের স্থায়ী ক্যালেন্ডার তৈরির প্রশিক্ষণ চালু করেন হযরতওয়ালা (রহ.)। এর জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করেন দেশের সকল জেলার সূর্য উদয়-অস্তের তালিকা, যা বিশাল আকারের দুই ভলিয়মে সংরক্ষিত।

ফিকহের ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে অত্যন্ত যত্নের সাথে মেহনত করাতেন হযরতওয়ালার হাতে গড়া ছাত্র মাওলানা মুফতী জামালুদ্দীন সুবহানী (রহ.)। হযরতওয়ালার (রহ.) অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন তিনি। ইলম-আমলের সমন্বয় তাঁর জীবনে এমনভাবে ঘটেছিল দূর অতীতেও যার নজির মেলা ভার। অল্প বয়সেই তিনি গত ২২ শা'বান ১৪৩৫ হিজরি জুমার নামায চলাকালে বসুন্ধরাতেই ইন্তেকাল করেন। প্রিয় এই ছাত্রের ইন্তেকালে হযরতওয়ালা (রহ.) যারপরনাই ব্যথিত হয়েছিলেন। সাথে আরো যোগ হয়েছিল তাঁর জানাযা ও দাফন করতে না পারার যাতনা। ওয়ারিশদের পীড়াপীড়িতে লাশ গ্রামের বাড়ি সাতকানিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানাযা ছাড়া প্রিয় ছাত্রকে বিদায় দিতে যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার লক্ষণ সেদিন হযরতওয়ালার (রহ.) বেদনামাখা চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। হুইল চেয়ারে করে নিজেই অ্যাম্বুলেন্স

পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তাঁর সামনেই গাড়িতে লাশ তোলা হচ্ছে। দরজা বন্ধ করে অ্যাম্বুলেন্স সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আর তিনি অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ব্যথাতুর হৃদয়ে তখন কী পরিমাণ রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তা কেউ টের না পেলেও হযরতের চাহনি দেখে সেদিন চোখের পানি সংবরণ করা যায়নি। হৃদয়ের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করে সেদিন তিনি বলেছিলেন, জামাল সাহেব যদি যেখানেই মৃত্যু হবে, সেখানেই দাফনের অসিয়ত করে যেতেন, যেমনটি আমি করে রেখেছি তবে আজ কারো কথাই শুনতাম না, এখানেই দাফন করতাম। মুফতী জামালুদ্দীন (রহ.)-এর ইলমী মাকাম প্রকাশ করতে গিয়ে সেদিন হযরতওয়ালা (রহ.) বলেছিলেন, তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন। আমার চেয়েও বড় আলেম ছিলেন। মনে করেছিলাম আমার পরে তিনিই মারকাযের হাল ধরবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তিনি আমার আগেই চলে গেলেন।

নামাযের সময়সূচি নির্ণয়ে জ্যোর্তিবিদ্যার মূলনীতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন মুফতী জামালুদ্দীন (রহ.)। তাঁর গবেষণার সামনে বড় বড় বিজ্ঞানী আর আবহাওয়াবিদরাও নত হয়ে যেতেন। একবার আবহাওয়া অফিসের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা যিনি বড় আবহাওয়াবিদও ছিলেন, নামাযের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারে ভুল আছে বলে দাবি তোলেন। চতুর্দিকে এ নিয়ে হৈচৈ শুরু হলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এগিয়ে আসে এর সমাধান করতে। বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে ফাউন্ডেশনে বৈঠক বসে। সেদিন হযরতওয়ালার (রহ.) প্রতিনিধি হিসেবে বৈঠকে যোগদান করেন মুফতী জামালুদ্দীন (রহ.) ও মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী দা. বা.। দেশের বাঘা বাঘা আবহাওয়াবিদ, বিজ্ঞানীরা সেদিন মুফতী জামালুদ্দীন (রহ.)-এর যুক্তিনির্ভর বক্তব্য মাথা পেতে নিতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার নির্ভুল প্রমাণ করে দেখান।

ইন্তেকালের কয়েক বছর পূর্ব থেকে তিনি চাঁদের উদয়-অস্ত, আলো-হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান। চন্দ্র মাসের স্থায়ী ক্যালেন্ডার তৈরি করা নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। ওই গবেষণার ফলে চাঁদের মাসের সম্ভাব্য শুরু-শেষ তারিখ নির্ণয় করা যায়। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে থাকে। এ বিদ্যাতে ছাত্রদের পারদর্শী করে তুলতে বিষয়টি যোগ করা হয় পাঠ্যসূচিতে।

সার্বক্ষণিক নেগরানী

ইলম অত্যন্ত বখিল। ইলমের তরে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিলেও সে কিঞ্চিতদানে সম্মত হতে চায় না। আর সেটা যদি ইলমে ফিকহ হয় তবে তো আর কথাই নেই। কী পরিমাণ সাধনা-আরাধনা যে দরকার ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য তা অতীত মনীষীদের জীবনী থেকে অনুমান করা যেতে পারে। কঠিন এই সাধনার জন্য হযরতওয়ালা (রহ.) যেভাবে নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছিলেন, ছাত্রদেরকেও সেভাবে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। তাই তো প্রিয় এ প্রতিষ্ঠানকে তিনি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। অনাবাসিক কোনো ছাত্র এখানে ভর্তি করা হয় না। ছাত্ররা সার্বক্ষণিক মারকাযে অবস্থান করে মেহনত করবে। উস্তাদগণ তাদের নেগরানীতে রত থাকবেন। বাহিরে কোনো ধরনের মাশগালা, অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, ইমামতী, খতীবি বা ওয়াজ-বয়ানে গমন উস্তাদদের জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেন। তিনি যেকোনো এক কাজের জন্য ফারেগ হতে বলতেন। ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত উস্তাদদের অন্য কোনো খেদমতে মশগুল হওয়াটা হযরতওয়ালা (রহ.) পছন্দ করতেন না। কারণ এতে ছাত্রদের হক্ব নষ্ট হবে। মাহফিলের জন্য নির্ঘুম রাত কাটালে সকালে সবক পড়ানো কী করে সম্ভব হবে? ঘুমের সাথে লড়ে তো আর টিকা যাবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবকের ব্যাঘাত ঘটবে। তাই এমন কাজ হযরতওয়ালা (রহ.) পছন্দ করতেন না। ছাত্রদের হক্বের ব্যাপারে এমন সচেতনতাই তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হতো। উস্তাদদের সার্বক্ষণিক নেগরানীর ফলে ছাত্ররা যেভাবে মোতালা'আয় ব্যস্ত থাকছে, তদ্রূপ সকাল-সন্ধ্যা তামরীন ইস্তিফতার উত্তর তৈরি করে দেখাতে পারছে।

ছাত্র তৈরির কারিগর

আজকাল ছাত্রদের মাঝে কিছু দুর্বলতা মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে। যেমন–হাতের লেখা অসুন্দর হওয়া বা বানান ভুল করা। বিশেষ করে বাংলা বানান। হযরতওয়ালা (রহ.) ছাত্রদের এ সকল দুর্বলতা দূর করার জন্য বিভিন্ন মেহনতের ব্যবস্থা করেছেন। ফিকহের ছাত্রদের প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে বাংলা, উর্দূ ও আরবী হাতের লেখা লিখতে হয়। তিন ভাষার বানান শেখার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে ইমলা করতে হয়। হযরতওয়ালা (রহ.) ছাত্রদের তামরীন দেখার সময় হাতের লেখা এবং বানানের প্রতি গভীর নজর দিতেন। বানান ভুল হলে বা কিতাব থেকে নকল করতে কোনো শব্দ বাদ পড়ে থাকলে হযরতের দৃষ্টি সেখানে আটকে যেত। সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলতেন এবং মূল কিতাব আনিয়ে সংশোধন করাতেন। উস্তাদদেরকেও এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিতেন। এমনি একদিনের ঘটনা। ০১/০৬/০৮ ইং এশার নামাযের পর ফিকহ প্রথম ও

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের এবং ফাতওয়া বিভাগের মুফতীয়ানে কেরামকে বসার জন্য এলান করলেন হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নিজেই। সকলের মনে একই প্রশ্ন–কী যেন বলবেন? অবশেষে এর উত্তর পাওয়া গেল। সকলকে কাছে কাছে বসতে বলা হলো। এরপর হযরত বললেন, এ বছর একটি কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, অর্থাৎ সকল ফাতওয়া আমি দেখার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ তা চালু আছে। কিন্তু এতে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে! করব কী, দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু কতবার ঠিক করা যায়? একজন ছাত্র আজ তিনবার গিয়েছে, কিতাবের ইবারত ভুল উঠানোর কারণে তাকে বারবার ফেরত পাঠানো হয়েছে। মাসআলা লিখেছে জায়েযের আর দলিল লিখে এনেছে নাজায়েযের। এটা কেমন কথা? অথচ তার খাতায় জায়েযের দলিলও রয়েছে। আমি পূর্বেই দেখেছি কিন্তু সে দেখছে না। বলো তো, এদেরকে কী করা যায়? তাই এখন থেকে নিয়ম করে দিলাম, ফাতওয়ার কাগজে উত্তর ওঠানোর পর মুশরিফকে দেখিয়ে তারপর আমার কাছে আনতে হবে। আমি দেখতে পারব না, শুধু দস্তখত করে দেব। তবে মাঝে মাঝে খবর নেব মুশরিফকে দেখানো হয়েছে কি না? তখন ভুল ধরা পড়লে মুশরিফকে ডাকব। আমি শুধু প্রথমবার দেখব, ভুল থাকলে ঠিক করে দেব, এরপর আর দেখব না।

অনেকের হাতের লেখা খারাপ, এরা ফাতওয়া লেখার যোগ্য নয়। বছরের শুরু থেকে বলছি হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য। আট মাস হলো এখনো হলো না। যাদের হাতের লেখা সুন্দর নয় তারা অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে। প্রয়োজনে তাকে কিছু পয়সা দেবে, অসুবিধা কী? আমি দারুল উলূম দেওবন্দে থাকতে সবকের তাকরীর লিখতাম। আমার এক সাথি যে পরে হাটহাজারীর শিক্ষক হয়েছে, আমাকে বলে যে তার খাতায় তাকরীর লিখে দিতে। আমি বললাম দেব তবে পয়সা দিতে হবে, প্রতি পৃষ্ঠায় দুই আনা। সে রাজি হলে আমার খাতা থেকে প্রতিদিন রাতে তার খাতায় তাকরীর লিখে দিতাম। আমার খাতা সামনে রাখতাম আর ওর খাতা হাতের নিচে থাকত। আমার খাতায় নজর থাকত আর নিচে হাত চলতে থাকত। ৫-৬ আনার লেখা শেষ হলে ঘুমিয়ে পরতাম। অসুবিধা কী এভাবে আমার চায়ের পয়সা হয়ে যেত। বছর শেষে প্রায় ৬০০ আনা উজরত এল। সে কাঁদে–ভাই, ১০০ আনা মাফ করে দাও। আমি মাফ করে দিলাম। ৫০০ আনা পেলাম। এভাবে সে তাকরীরের খাতা পেয়ে গেল, পয়সা খরচ করল আর আমার হাতের লেখা শিখার কাজও হয়ে গেল। আমার হাতের লেখা বেশি সুন্দর নয়, তবে খুব সহীহ শব্দ লেখা। দ্রুত লিখতে পারি। তাই প্রয়োজনে তোমরাও অপর সাথির মাধ্যমে লিখিয়ে নেবে। হাতের লেখা সুন্দর না হলে ফাতওয়া লিখতে দেওয়া হবে না।

শরীফ সাহেবকে বলেছি পরিষ্কার লেখা না হলে প্রশ্ন জমা না নিতে। কী ব্যাপার, আপনি কেন নেন? খাতির করেন কী জন্য? মনে হয় আপনি পড়ে দেখেন না। কম্পিউটারের যুগ প্রয়োজনে কম্পোজ করে প্রশ্ন জমা দেবে। অপরিষ্কার লেখা পড়ার সময় আমাদের নেই।

কিতাবে যেমন লেখা আছে, তেমনভাবেই লিখতে হবে। ফ্যাশনের লেখা চলবে না। বুঝতে পারছো? মানে ছাপার লেখার মতো লেখা হতে হবে। অনেকে উর্দূ লিখতে পারে না, পড়তেও পারে না। এরা ফাতওয়া পড়তে কেন এসেছে? মুদাররিস হয়ে গেলেই তো পারত। অযথা নিজের দোষ প্রকাশ করার কী দরকার? ফাতওয়া লেখা মানে নিজের দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। ভুল বানান দেখলে মানুষ কী বলবে? মান-সম্মান কি বাকি থাকবে? যারা উর্দূ জানে না অথচ ফাতওয়া পড়তে এসেছে তারা গাধা। ফাতওয়ার কিতাব উর্দূতে, দলিল লিখতে হবে উর্দূতে, তাহলে উর্দূ না জানলে কিভাবে ফাতওয়া লিখবে? মনমতো লিখলে হবে না, কিতাবে যেভাবে আছে, সেভাবেই লিখতে হবে।

ফিকহী সেমিনার

সমকালীন জটিল কোনো মাসআলা সমাধানে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মুফতীদের সমন্বয়ে সেমিনার আয়োজনের ধারা বাংলাদেশে চালু করেন হযরতওয়ালা (রহ.)। বসুন্ধরা মারকায প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহুবার এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে আগমন করেছেন দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ ও মকবুল ফকিহ ও মুফতীগণ।

ফিকহুল মু'আমালাত

হালাল রিজিক ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। ফিকহুল ইবাদতের চেয়ে তাই ফিকহুল মু'আমালাত অগ্রগামী। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল আপনি তাসাউফের ওপর কোনো কিতাব লেখেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন কেন আমার লেখা কিতাবুল বুয়ু (ক্রয়-বিক্রয়) দেখো না। সেটাই তো সবচেয়ে বড় তাসাউফের কিতাব। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ ইলম আজ অবহেলিত। মু'আমালাসংক্রান্ত ফিকহী মাসায়েল শুধু নামকেওয়াস্তেই পড়ানো হয়। হযরতওয়ালা (রহ.) মু'আমালার মাসায়েলের ক্ষেত্রে বরাবরই সচেতন ছিলেন। অতুলনীয় ছিল তাঁর মোয়ামালার স্বচ্ছতা। দারুল উলূম দেওবন্দের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মুফতী জামিল আহমদ দা.বা. বলেন, ইবাদতের বুজুর্গ অনেক পাওয়া যাবে; কিন্তু

মু'আমালার বুজুর্গ কমই আছে। আমাদের হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন মু'আমালার বুজুর্গ।

ইসলামী অর্থনীতি

হালাল রিজিক নির্ভর করে হালাল উপার্জনের ওপর। হালাল উপার্জনের জন্য চাই সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা। আর তাই অন্য সকল বিধিবিধানের সাথে সাথে ইসলাম প্রণয়ন করেছে সুদমুক্ত অর্থনীতি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে আজ সারা বিশ্বে সুদি অর্থব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আছে সুদের অভিশাপ। মুসলিম উম্মাহকে এ অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে বিশ্বের দেশে দেশে শুরু হয়েছে আন্দোলন। কী করে সুদি ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে সচল করা যায় তার প্রচেষ্টা। কিন্তু দীর্ঘ ২০০ বছরের সুদি ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বর্তমান দুনিয়ায় অর্থব্যবস্থার সূতিকাগার হচ্ছে ব্যাংক। একটি দেশের গোটা অর্থনীতি পরিচালিত হয় ব্যাংককেন্দ্রিক। লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, অফিস-আদালত–সব কিছুর সম্পর্ক ব্যাংকের সাথে। অতএব প্রথমে ব্যাংকব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে ইসলামী ছাঁচে। সুদমুক্ত করতে হবে এর লেনদেন। কথায় আছে, কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না। তাই বলে বসেও তো থাকা যায় না। সাধ্যমতো চেষ্টা তো করতে হবে। এ চেষ্টারই ফসল এ দেশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং। ১৯৮৩ ইং সালে যার গোড়াপত্তন হয়েছিল। সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকের যে শরয়ী কাউন্সিল গঠন করা হয়, তাতে সদস্য হিসেবে থাকেন হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। চতুর্দিক থেকে সমালোচনা শুরু হয়। সমালোচনার বাণে জর্জরিত হয়েও উদ্দেশ্যপানে এগিয়ে গেলেন এই মর্দে মুজাহীদ। যুগের মুজাদ্দিদ যাঁরা হন তাঁরাই শুধু এমন ঝুঁকি নিতে পারেন। ইতিহাস তা-ই বলে। মুজাদ্দিদের কাজ প্রথমে কারো বুঝে আসে না। ধীরে ধীরে কাজের মাধ্যমে সমর্থন আদায় করে নেন।

হযরতওয়ালা (রহ.) তখন পটিয়ায় ছিলেন। ব্যাংকের মিটিংয়ে ঢাকায় আসতে হতো। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম যখন শুরু হলো এ বিষয়ে কারো তেমন ধারণা ছিল না। আমাকে শরয়ী কাউন্সিলের সদস্য বানানো হয়েছিল। আমিও তখন এগুলো বুঝি না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, মিটিংয়ে যা কিছু আলোচনা থাকত তা আমাকেই করতে হতো। আমি যদি কোনো দিন আসতে না পারতাম তাহলে মিটিং মুলতবি করে দিত। এমন দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের আন্দোলন শুরু হয়ে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এখনো মঞ্জিলে পৌঁছেনি।

সুদহীন ব্যাংকের স্বরূপ

হযরতওয়ালা (রহ.) বলতেন, ইসলামী ব্যাংকের মুনাফাকে মায়ের দুধ মনে করার অবকাশ নেই। আমরা কাউকে ইসলামী ব্যাংকে যেতে বলি না। ব্যাংকে লেনদেন করতে যারা বাধ্য হচ্ছে, এটা তাদের বেলায় মন্দের ভালো মাত্র। কিতাবে মাসআলা রয়েছে, হিন্দুর দোকান থেকে গোশত ক্রয় করা যাবে না। যদিও সে হুজুর দিয়ে গরু জবাই করে আনে। পক্ষান্তরে মুসলমান কসাই থেকে গোশত ক্রয় করার ক্ষেত্রে সন্দেহ করারও অবকাশ নেই। তাই সুদহীন ব্যাংকিংব্যবস্থা সুদি ব্যাংকিংব্যবস্থার তুলনায় নিরাপদ। সুদি ব্যাংক আর সুদহীন ব্যাংক কখনো এক হতে পারে না। যারা বলে এর মাঝে ফারাক নেই, তারা না জেনে বলে। বুঝে না বলা যাবে না, তবে বোঝার চেষ্টা করে না। মানতেকের কঠিন কঠিন বহস যারা বোঝে তারা চেষ্টা করলে ব্যাংকিংও বুঝতে পারে।

সর্বপ্রথম কোর্স

এ দেশের আলেম সমাজের কাছে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিত করে তুলতে হযরতওয়ালা (রহ.) যুগান্তকারী এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২০০৩ ইং সালে তিনি এ বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেন। দেশের মাটিতে এটাই ছিল সর্বপ্রথম উদ্যোগ। সাহসীই শুধু নয় বরং দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা একে তো বিষয়টি আলেম সমাজের কাছে বিতর্কিত আবার কোর্স যাঁরা দেবেন সেই প্রশিক্ষকদ্বয় বাচ্চা বয়সের। তাঁদের পিতা এবং দাদার অনেক ছাত্র এখানে আছেন। এত জুনিয়রদের ক্লাসে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ মুফতী মুহাদ্দিস ও মুদাররিসদেরকে ছাত্র সাজিয়ে বসানোর হিম্মত আছে কার? কিন্তু ইলম অর্জনের যে কোনো বয়স নেই তাই জানিয়ে দিলেন এ দেশের আলেম সমাজ। ইলম হাসিলের জন্য ঝেড়ে ফেলে দিলেন সকল সংকোচ। সপ্তাহব্যাপী রাত-দিন বিরামহীনভাবে চলতে লাগল প্রশিক্ষণ কোর্স। বয়সের ব্যবধান ভুলে তালিবুল ইলমের কাতারে মিলেমিশে একাকার হলো সবাই। সময় যত গড়ায় তৃষ্ণা তত বাড়ে। কোর্সের প্রতিটি পর্ব শেষে সকলের মাঝে কাজ করত একপ্রকার হাহাকার। এত দিন কোথায় ছিলাম আমরা, ফিকহুল মু'আমালাত কিছুই শেখা হয়নি আমাদের, আরো অনেক শেখার আছে, শিখতে হবে আমাদের। ইত্যাদি ইত্যাদি। উলামায়ে কেরামের আগ্রহের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার দেখে হযরতওয়ালার (রহ.) মাঝে স্বস্তির

লক্ষণ ফুটে উঠল। তাঁর হিম্মত অনেক গুণ বেড়ে গেল। পরের বছর মারকাযে চালু করলেন ফিকহুল মু'আমালাতের ওপর দুই বছরের কোর্স আল-ইকতিসাদুল ইসলামী। এরপর পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষক এনে আরো দুবার প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেন।

কোর্স শেষে মতামত

প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কোর্সে অংশগ্রহণকারী উলামায়ে কেরাম। তাঁদের মতামতের মাঝে ফুটে ওঠে কোর্সটির সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা। উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা মুনাসেব মনে হচ্ছে।

মুফতী আবু সাঈদ দা.বা. (ফরিদাবাদ) বলেছেন, আমরা এখন মুরব্বিশূন্য। এমন এক মুহূর্তে আমাদের হযরত মুফতী সাহেব আমাদেরকে এমন একটি কাজের জন্য আহবান করেছেন ও আয়োজন করেছেন আমার জানা মতে গোটা বাংলাদেশে যা সর্বপ্রথম আয়োজন। এর প্রতিদান টাকা-পয়সার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা মুফতী সাহেবের নেক হায়াতে বরকতের জন্য দু'আ করব। আমরা অনেক সময় ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকি যে এটা ও সুদি ব্যাংকের মাঝে তেমন কোনো ব্যবধান নেই। কিন্তু বাস্তবে আমরা এ বিষয়ে অন্ধকারে ছিলাম, তিনি আমাদেরকে আলোতে এনেছেন। যাঁদের কাছ থেকে আমরা এই কোর্স নিলাম যদি শুধু তাঁদের কিতাব মোতালা'আ করতাম তাহলে সারা জীবনেও তা বুঝতে পারতাম না এখন যা বুঝতে পেরেছি। কারণ তাঁরা নিজেরাই এ বিষয়ে জড়িত ও তাঁদের রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই এক সপ্তাহে যা কিছু শেখা হলো তা এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এক মাসেও এটা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। কারণ অনেক লম্বা সময় ক্লাস হয়েছে। এই কোর্সের মাধ্যমে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা এত দিন শুধুমাত্র থিউরিক্যাল ছিল, এখন তা বাস্তবে রূপান্তরিত হলো। দ্বীনের অর্ধেক ইলমই হলো মু'আমালা। এ ব্যাপারে আমরা ইলম অর্জন করতে পেরেছি।

মাওলানা মোস্তফা হোসাইনী দা.বা. বলেন,

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

হযরত ফকীহুল মিল্লাতের শুকরিয়া আদায় না করলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হবে না। আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ পাঠান। আমরা মনে করতাম, সুদি ব্যাংক হারাম এতটুকু ফাতওয়া দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু জানতাম না যে ইসলামী ব্যাংকিংও সম্ভব। এখন তা বুঝে এসেছে। আমার কাছে একটি ওয়াসওয়াসা ছিল যে এই ব্যাংকিংয়ে জড়িত হলে ইসলামের লক্ষ্য থেকে আমরা সরে পড়ব। কিন্তু মুফতী সাহেবের এক উত্তরে আমার সব ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে গেছে। তিনি আমাকে বলেন যে, মিয়া প্রস্রাব করাও তো আখেরাতের কাজ, যদি তা তরীকামতো করা হয়। এরপর আমার সকল ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যায়। আমরা যারা হেদায়া সালেস পড়াই আমি নিজেও ১৫ বছর পড়িয়েছি। কিন্তু আমার বোঝার মধ্যে নকস ছিল। এখন তা অনেকটা দূর হবে।

সমাপনী ভাষণ

সমাপনী ভাষণে হযরতওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, من تواضع لله رفعه الله

"আপনারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উলামায়ে কেরাম এখানে এসে কোর্স গ্রহণ করেছেন। এটা আমার জন্য কোনো বড় বিষয় নয়, তবে আপনারা ছাত্রজীবন গ্রহণ করার যে আদর্শ পেশ করেছেন, তা এক বিরল ঘটনা। আর এটাই হলো তাওয়াজু, বিনয়। তাই জাহিরিভাবে আপনারা ইসলামী অর্থনীতি اقتصاد اسلامی যাই শেখেন বাতিনি তারাক্কি যা অনেক মেহনত করেও অর্জন সম্ভব হয় না আপনারা তা অর্জন করেছেন। আমি ব্যাপকভাবে আলেমদের দাওয়াত দিইনি একটি ভয়ের কারণে। আর তা হলো আমাদের আলেমরা হয়তো ভাববেন যে ত্বকী সাহেব ও রফি সাহেব আমাদের উস্তাদ উনাদের ছেলেদের কাছে আমরা কী শিখব? কিন্তু আপনাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে আমার এ ভয় দূর হয়ে যায়। আমার এখন এত হিম্মত যে ইনশাআল্লাহ আগামী শাওয়াল থেকে এখানে অর্থনীতির বিভাগ খোলা হবে।"

নতুন বিভাগ

পরের বছর বসুন্ধরা মারকাযে যোগ হয় নতুন এই বিভাগ। পরবর্তীতে ওই নতুন বিভাগই ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে। যার নামকরণ করা হয় মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামী। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এযাবত বাংলাদেশের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে আল্লাহ তা'আলা হযরতওয়ালার (রহ.) মেহনত ও ফিকিরকে কবুল করে একসময় দেশে ফিকহুল মু'আমালাতের প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে দেবেন, যেমন ছড়িয়ে দিয়েছেন ফিকহুল ইবাদতের প্রতিষ্ঠান। ফলে সুদের অভিশাপমুক্ত হবে এ দেশের মানুষ। আর হযরতের জন্য তা হয়ে থাকবে সদকায়ে জারিয়ার এক বিশাল ভাণ্ডার। কেয়ামত পর্যন্ত এ দেশে ইলমে ফিকহ নিয়ে যত মেহনত হবে, চাই তা ফিকহুল ইবাদত হোক বা ফিকহুল মু'আমালাতের সাওয়াব হযরতওয়ালার (রহ.) আমলনামায় যোগ হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

তানযীমুল মাদারিসিল কাওমিয়্যা বাংলাদেশের সাধারণ সভায় উলামা-মাশায়েখ ও তানযীম নেতৃবৃন্দ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবস্থান অনুসরণীয়

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং মঙ্গলবার, সকাল ৯ ঘটিকায় জামীল মাদরাসা বগুড়ায় অবস্থিত তানযীম ভবনের সম্মুখস্থ ময়দানে তানযীমুল মাদারিসিল কাওমিয়্যা বাংলাদেশের উদ্যোগে জঙ্গিবাদসহ বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয় তানযীমের সাধারণ সভা। এতে অংশগ্রহণ করেন ১৪ হাজারের মতো শিক্ষক প্রতিনিধি। বলতে গেলে তানযীমুল মাদারিস বাংলাদেশের প্রাক্তন চেয়ারম্যান উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি ফকীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর এটি সর্বপ্রথম একটি বড় আয়োজন। হাজার হাজার উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী (দা. বা.), সভাপতিত্ব করেন তানযীম সভাপতি বগুড়া জামীল মাদরাসার মুহতামিম জানশীনে ফকীহুল মিল্লাত হযরতুল আল্লাম মুফতী আরশাদ রহমানী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী বলেন, হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ইন্তেকালে সমাজ, জাতি বিশেষ করে কওমী মাদরাসার আলেম-উলামা ও ছাত্ররা একজন বিজ্ঞ সফল ও নিষ্ঠাবান অভিভাবক হারিয়েছে। যার অবস্থান আমাদের সব ধরনের সমস্যা সমাধানে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। এ দেশের কওমী মাদরাসাগুলোকে সকল ফিতনা ও সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখতে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর সাহসী পদক্ষেপগুলো সকলের অনুসরণীয় বলে আমি মনে করি। সমসাময়িক যেকোনো ফিতনার মোকাবিলায় তাঁর প্রজ্ঞা ও হেকমতপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের সকলের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ মিশন ছিল, কওমী মাদরাসাগুলো যেন আকাবির ও আসলাফের চিন্তাধারায় অটল থাকে। এতে যেন কেউ চিড় ধরাতে না পারে। পরম বাস্তবতা হলো, কওমী মাদরাসাগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আকাবির ও আসলাফের চিন্তাধারার ওপর অটল থাকার বিকল্প নেই।

তানযীম সভাপতি মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব সভাপতির ভাষণে বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয় ও তানযীমের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এখানে তা হুবহু প্রকাশ করা হলো।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

اما بعد

তানযীমুল মাদারিসিল কাওমিয়্যা বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের মজলিসে উমূমীর সম্মানিত সভাপতি, মুহতারাম অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত কোরআন ও সুন্নাহর ধারক-বাহক, ওয়ারেসীনে উলূমে নবুওয়াত, হামেলীনে উসওয়ায়ে রিসালাত, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মুদাররিসীনে কেরাম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

মুহতারাম হাজেরীন!

দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ আজ চরম অস্থির ও কঠিন ক্রান্তিকর সময় অতিক্রম করছে। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ মুছে ফেলতে দেশি-বিদেশি নানা অপতৎপরতা, প্রোপাগান্ডা, পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাত্রায় সংযোজন ঘটছে অবিরত। এমন একটি সময়ে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর প্রচার-প্রসার ও সমাজের সর্বত্র সুন্নাতে নববী (সা.) বাস্তবায়নের মহান লক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। একই সাথে নবীয়ে করীম সরওয়ারে দূজাহানের রওজাপাকে অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

অসংখ্য ব্যস্ততা ও সফরের কঠিন কষ্ট উপেক্ষা করে যে সকল মুহতামিম হযরাত, অতিথিবৃন্দ এবং মুদাররিসীনে কেরাম এখানে তাশরীফ এনেছেন আমি তানযীমের পক্ষ থেকে সবাইকে সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাই এবং সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুহতারাম হাজেরীন!

যাঁদের অক্লান্ত মেহনত, লক্ষ্যভেদী অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তা-ফিকির, কঠিন ত্যাগ ও কোরবানীর বদৌলতে আজকের এই তানযীম হাঁটি হাঁটি-পা পা করে ক্ষুদ্র অঙ্কুর থেকে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়েছে। যাঁদের কুশলী পরিচর্যায় এই নয়নাভিরাম উদ্যান, তাঁদের অনেকে আজ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁদের অন্যতম হযরত সদরে তানযীম ফকীহুল মিল্লাত (রহ.), আল্লামা ইউসুফ নিজামী (রহ.), সাবেক সভাপতি

তানযীম, আল্লামা আব্দুল জলীল (রহ.) সাবেক সেক্রেটারি তানযীম। আজকে বিশাল এই সমাবেশে আমরা তাঁদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। সাথে সাথে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত শোকরিয়া আদায় করছি আজকের বিশাল এই আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। বিশেষ করে আল্লামা মাহমুদুল আলম, সহসভাপতি তানযীম, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, সহসভাপতি তানযীম, আল্লামা হারুন চৌধুরী, সেক্রেটারি তানযীম, আল্লামা আব্দুল হক হক্কানী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তানযীমসহ সকল জেলা কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি ও সকল সদস্যবৃন্দ, সম্মেলন আয়োজনের বিভিন্ন সাবকমিটির দায়িত্বশীলগণের। অন্তরের অন্তস্তল থেকে দু'আ করছি মহান রাব্বুল আলামীন সকলকে উভয় জাহানে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মুহতারাম হাজেরীন!

আজকের এই বিশাল সমাবেশে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

وما توفيقى الا بالله

☆ সদরে তানযীম হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর উত্তরবঙ্গে আগমন ও কর্মতৎপরতা।

☆ তানযীম গঠন।

☆ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তানযীমের অবস্থান।

☆ সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনে তানযীমের ভূমিকা।

☆ নেসাবে তালীম।

☆ তানযীমের বর্তমান কর্মতৎপরতা।

☆ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

☆ বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয়

সদরে তানযীম হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর

উত্তরবঙ্গে আগমন ও কর্মতৎপরতা

১৯৬০ সাল, পশ্চিমের একটি প্রদেশ ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। এ দেশের এক-চতুর্থাংশ বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ। হাজার বছর ধরে প্রবহমান বাংলাদেশের অক্ষরেখা খ্যাত যমুনা নদী বিচ্ছিন্ন করেছে উত্তরবঙ্গকে দেশের অন্য অংশ থেকে। ফলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি কোথাও। শূন্যতা, অপূর্ণতার বেমানান দৃশ্য চোখে পড়ছিল সর্বত্র। জাগতিক উন্নয়নেই শুধু লাগেনি; তা নয়, ধর্মীয় শিক্ষা, অনুভূতি, চেতনারও অভাব ছিল প্রকট। তদানীন্তন ইসলামী শিক্ষার সূতিকাগার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আজীজুল হক (রহ.) তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত ইসলামের প্রচার-প্রসারের জযবা দ্বারা গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন, এতদাঞ্চলের জাগতিক উন্নয়ন হোক বা না হোক, দ্বীনি কার্যক্রম চালু করতে হবে। যেই ভাবা, সেই কাজ। তারপর কিছু ভক্তের পরামর্শ ও জামীল উদ্দীন লি.-এর চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ সোহাইল (রহ.) ফাজেলে দেওবন্দ ও তাঁর পরিবারের ঐকান্তিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন তিনি। একজন তরুণ আলেম, যাঁর মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন নবসৃষ্টির উচ্ছ্বাস, অদম্য প্রেরণা, অনির্বাণ স্পৃহা, ত্যাগ, সততা, নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার যোগ্যতা। তাঁকে প্রেরণ করলেন উত্তরবঙ্গে। উদ্দেশ্য দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা, অনুভূতি ও জযবা পয়দা করা।

তরুণ সেই আলেম তাঁর পরম মুরব্বির নির্দেশে দু'আ ও হেদায়াতকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে মহান আল্লাহর রহমতের ওপর অটল আস্থা ও অবিচল ভরসা নিয়ে পৌঁছলেন উত্তরবঙ্গে। ঘুরে দেখলেন প্রতিটি জনপদ। বিশাল এই অঞ্চলে খালেস দ্বীনি শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকায় পুরো অঞ্চল ছিল কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আতের আঁতুড়ঘর। পরিবেশ-পরিস্থিতির এমন ভয়াবহতা অবলোকনে দ্বীনের তরুণ এই দাঈ ঘাবড়ে গেলেন, তবে হিম্মত হারালেন না। হৃদয় ভারাক্রান্ত হলো, তবে উতলে উঠল দ্বীনের গভীর দরদ। সিজদাবনত আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করলেন তিনি, ভিক্ষা চাইলেন মহান প্রভুর কাছে সাহস ও সৎসঙ্গী। কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে নেমে পড়লেন মিশনে। তৈরি করে নিলেন নিঃস্বার্থ কিছু সঙ্গী-সাথী। শুরু করলেন অপ্রতিরোধ্য এক পথচলা। কঠিন ত্যাগ, অজস্র মেহনত, বে-মেসাল কুরবানীর মাধ্যমে পার করলেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আটটি বছর। ফলে গড়ে উঠল বেশ কিছু দ্বীনি দুর্গ–কওমী মাদরাসা। এর মধ্যে অন্যতম বগুড়া জামীল মাদরাসা। ছড়ানো শুরু করল পুষ্পের সুমধুর ঘ্রাণ। বইতে শুরু করল ইসলামী শিক্ষার সুবাতাস। অনির্বাণ প্রদীপ শিখা জ্বেলে তিনি ফিরে এলেন কেন্দ্র তথা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায়। কিন্তু এই উদ্যমী আলেমের গতি যে রোধ্য হওয়ার নয়। আসমানের মনশা ছিল তাঁর জ্বলমলে আলো দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দেওয়ার। তাই নবপ্রেরণা নিয়ে তিনি ছুটে চললেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। ফিরে এলেন ঢাকায়। ছিলেন তরুণ এক আলেম ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন মুফতীয়ে আজম ও ফকীহুল মিল্লাত।

১৯৬০ সালের সে তরুণ ২০১৫ ইং-তে পরপারে পাড়ি জমালেন। তারুণ্যের ৮ বছরে উত্তরবঙ্গের আলেম-উলামা ও ছাত্রদের সাথে যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল, নাড়ির বন্ধনের ন্যায় জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও সর্বতোভাবে অটুট ছিল সে বন্ধন। চিড় ধরেনি সে বন্ধনে কোনোকালে, কোনোভাবে। ছয় দশক পূর্বে লাগানো বীজ জীবনসায়াহ্নে মহীরুহ ধারণ করতে দেখে গেলেন

তিনি। গড়ে ছিলেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। সে সংখ্যা তাঁর জীবনে ছড়িয়েছে হাজারের অধিক।

অটুট সে বন্ধনের কারণে পুরো উত্তরাঞ্চলজুড়ে ধর্মীয় যেকোনো কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)।

হাদীস শরীফে আছে 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসো।' হযরত ফকীহুল মিল্লাত বলতেন, 'আমার কাছে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনি সম্পর্কই সবচেয়ে বড়। রক্তের সম্পর্ক এপারের, দ্বীনি সম্পর্ক এপার-ওপার সর্বত্রই।' ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর জীবনজুড়ে এর বাস্তবায়ন স্পষ্ট ছিল। চাটগামী একজন মানুষ উত্তরবঙ্গবাসীকে দ্বীনি সম্পর্কের ভিত্তিতে এমনভাবে ভালোবেসে ছিলেন, যার পূর্বদৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ফলে উত্তরবঙ্গের আলেম-উলামা-ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র। এই ছিল উত্তরবঙ্গে ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর আগমনের প্রেক্ষাপট ও কর্মতৎপরতার ক্ষুদ্র চিত্র।

তানযীম গঠন

বৃহত্তর উত্তরাঞ্চলজুড়ে গড়ে ওঠে হাজারের অধিক কওমী মাদরাসা। এর অধিকাংশের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। মাদরাসাসমূহের পড়ালেখার মানোন্নয়ন, তারবিয়াতের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আর্থিক সহযোগিতায় তাঁর ভূমিকা বরাবরই অব্যাহত ছিল। একপর্যায়ে তিনি অনুভব করলেন, বিশাল এই অঞ্চলের আলেম-উলামাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সর্বোপরি সম্মিলিতভাবে সকল মাদরাসাগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গঠনের বিকল্প নেই। এই চিন্তা-ধারণা থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার উলামায়ে কেরামকে নিয়ে ১৯৯৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলা কওমী মাদরাসা সংগঠন 'তানযীম' নামে কাজ শুরু করেন। এই সংগঠনের কার্যক্রম দেখে অন্যান্য জেলার আলেমগণ সজাগ হন। তাঁরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে গোটা উত্তরাঞ্চলের সকল মাদরাসার আলেম-উলামাদের নিয়ে তানযীমুল মাদারিসিল কাওমিয়্যা বাংলাদেশ নামে এই সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। ৩ এপ্রিল ১৯৯৫ ইং প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংগঠন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তানযীমের অবস্থান

১৯৯৫ ইং সালে প্রতিষ্ঠার পর হাঁটি হাঁটি-পা পা করে আজ গোটা উত্তরাঞ্চলের সকল দ্বীনি মাদরাসার ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে এই তানযীম। তানযীমের চেয়ারম্যান হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা, নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিষ্ঠা ও এখলাসের বরকতে দেশের জাতীয় যেকোনো ইস্যুতে তানযীমের প্রশংসনীয় ও কার্যকরী ভূমিকা সবার কাছে স্পষ্ট।

২০০৫ সালে সারা দেশ কেঁপে উঠল পাঁচ শতাধিক বোমা বিস্ফোরণে। ক্ষত-বিক্ষত হলো অসংখ্য মানুষ। উত্তরাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় গড়ে ওঠা একটি জঙ্গি সংগঠন এর দায় স্বীকার করে পুরো উত্তরাঞ্চলের মানুষকে আতঙ্কে ফেলে দেয়। তৎকালীন সরকারের শরিক তথাকথিত একটি ইসলামী দল এর দায়ভার কওমী মাদরাসার ওপর চাপানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এমন বিভীষিকাময় কঠিন মুহূর্তে দেশের কওমী মাদরাসাসমূহের সুযোগ্য অভিভাবক হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) তানযীমের ব্যানারে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে স্পষ্ট করে দেন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে কওমী মাদরাসার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। ছিল না কোনো কালেও। একই সাথে গোটা বিশ্বের সামনে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে হাজারো কওমী মাদরাসার পাঁচ হাজারের মতো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী উলামা সমাবেশ। ২৫ আগস্ট ২০০৫ ইং রোজ বৃহস্পতিবার তারিখে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর আহ্বানে তানযীমের উদ্যোগে আয়োজিত সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মিডিয়ার শতাধিক প্রতিনিধিও সমাবেশের শোভা বৃদ্ধি করেছে। সেই সমাবেশের পর আতঙ্ক দূর হয় কওমী অঙ্গনের। সবার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়, এসব বোমাবাজির সাথে কওমী আলেম-উলামা ও ছাত্রদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, থাকার প্রশ্নই আসে না।

সেদিনের জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশই শুধু নয়, হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত, হিকমত, প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ ও দৃঢ় কঠিন নিয়ন্ত্রণের ফলে আজ গোটা উত্তরাঞ্চলের মাদারিসে কাওমিয়্যা তুলনামূলক নিরাপদে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে দুর্বারগতিতে।

বলতে গেলে সদরে তানযীম হযরত ফকীহুল মিল্লাতই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও বোমাবাজির বিরুদ্ধে সবার আগে বজ্রকঠিন আওয়াজ তুলে ছিলেন। নববইয়ের দশকের শুরুতে কিছু বিপৎগামী মানুষ এ দেশে জিহাদের নামে যুবকদের ট্রেনিং করানোর জন্য একত্রিত করতে শুরু করে। সরকার, প্রশাসনসহ খোদ আলেম সমাজেরও এ নিয়ে তখন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। এর তীব্রতা, ভয়াবহতা ও সম্ভাব্য পরিণতি তখনো কেউ আঁচ করতে পারেনি। কারণ এগুলো সবেমাত্র শুরু। কারো বুঝে

আসছিল না, কী ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক তখনই হযরত (রহ.) খোদাপ্রদত্ত ফেরাসতের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন এগুলোর ভবিষ্যৎ কী? তাই তিনি ময়দানে নেমে পড়লেন। উদ্দেশ্য বাঁচাতে হবে কওমী মাদরাসাগুলোকে এদের খপ্পর থেকে। তাই তিনি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সফর করলেন। মাদরাসায় মাদরাসায় গিয়ে বোঝালেন, আলেম-উলামা ও ছাত্রদের। সতর্ক করলেন সবাইকে। উগ্র, উশৃঙ্খল এই দলটি ভিড়তে পারল না কওমী অঙ্গনে। তারা ক্ষেপল হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর ওপর। এল হত্যার হুমকি। কিন্তু আল্লাহর বান্দা ঘাবড়ালেন না। থামলেন না। তিনি ভীত হননি। শঙ্কিতও হননি। ছুটে চললেন রাত-দিন। একসময় জঙ্গিরা কওমী অঙ্গন থেকে নৈরাশ হয়ে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

পরবর্তীতে তারা যখন দেশব্যাপী জঙ্গি তৎপরতা শুরু করে তখন হুঁশ ফেরে প্রশাসনের। হাড়ে হাড়ে টের পায় সবাই। একপর্যায়ে প্রশাসন শক্ত হাতে এগুলোকে দমন করে। গ্রেফতার করে শত শত জঙ্গিকে।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সেদিনের মেহনতের সুস্পষ্ট ফলাফল জাতি প্রত্যক্ষ করে। এ পর্যন্ত যত জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে, ৯৯% কওমী অঙ্গনের বাইরের।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশ পুলিশের আইজি মহোদয় বলেছেন, 'কওমী মাদরাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না। জঙ্গিবাদের সাথে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।' (১৮/১২/২০১৫ তারিখের জাতীয় দৈনিকসমূহ) আমরা তাঁর বাস্তবধর্মী সাহসী এই বক্তব্যকে স্বাগত এবং তাঁকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনে তানযীমের ভূমিকা

কওমী মাদরাসাসমূহের অঞ্চলভিত্তিক বোর্ড গঠনের ইতিহাস অনেক পুরনো। সর্বপ্রথম বোর্ড গঠিত হয় ব্রিটিশ আমলে, কুতবে আলম মাদানী (রহ.)-এর নির্দেশে সিলেট অঞ্চলে–'আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম' নামে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে গঠিত হয় 'ইত্তিহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ' নামে। ঢাকা অঞ্চলে গঠিত হয় 'বেফাকুল মাদারিস' নামে। বৃহত্তর দক্ষিণবঙ্গেও 'বেফাক' নামে অন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। প্রতিটি বোর্ড তদীয়ভুক্ত মাদরাসাসমূহের তালীম-তারবিয়াতের মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ করে। বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের তানযীম বোর্ড বয়স বিবেচনায় নবাগত হলেও এর কার্যক্রম অল্প সময়ে ব্যাপক ও বিশাল আকার ধারণ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে একসময় হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) তানযীমের সদর হিসেবে বৃহত্তর এই পাঁচটি বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন অনুভব করেন। সব বোর্ডের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ শলাপরামর্শের পর বৃহত্তর চারটি বোর্ড নিয়ে ২০০৬ সালে 'সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' নামে কওমী অঙ্গনের বৃহত্তর একটি ঐক্যবদ্ধ ফোরাম গঠন করেন। এ বোর্ড গঠনে তানযীমের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বৃহত্তর এই ফোরাম জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ইসলামবিরোধী নারী নীতিমালা, হাইকোর্টের ফাতওয়াবিরোধী রায়, কওমী সনদের সরকারি স্বীকৃতি ইত্যাদিসহ জাতীয় পর্যায়ের ইস্যুগুলোতে সম্মিলিত কওমী মাদরাসা বোর্ড যথাসময়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত দিতে সামর্থ্য হয়।

নেসাবে তালীম

শিক্ষার মূল হলো, নেসাব বা সিলেবাস। সঠিক নেসাব নির্ধারণে ব্যর্থ হলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা অকার্যকর ও ভঙ্গুর হতে বাধ্য। কওমী মাদরাসার মূল নেসাব প্রণীত হয় প্রায় ২০০ বছর পূর্বে, আমাদের আকাবিরদের পবিত্র হাতে। পরবর্তীতে মূল নেসাব ঠিক রেখে যুগোপযোগী সংযোজন-বিয়োজন অব্যাহত রয়েছে।

বিগত ২০০ বছরে এই নেসাব পড়ে লাখো বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আদীব, মান্তেকী, ফলসফী তৈরি হয়েছে, যা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে আমাদের আকাবিরদের হাতে প্রণীত নেসাব সঠিক ও সফল।

এ পর্যন্ত কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো, নেসাব পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র। কারণ শত্রুরা জানত, কওমী মাদাসাকে পঙ্গু করতে হলে নেসাব পরিবর্তনের বিকল্প নেই। তাই তানযীম ও সদরে তানযীমের সর্বাত্মক মেহনত ছিল কোনোভাবেই যেন নেসাব পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ দেখাতে না পারে। আলহামদু লিল্লাহ, বর্তমানে তানযীমভুক্ত সকল মাদরাসা আকাবিরদের হাতে প্রণীত সে নেসাবের ওপর অটল ও অবিচল রয়েছে। সময়োপযোগী কোনো সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হলে মূল নেসাবকে ঠিক রেখে তানযীমের নেসাব কমিটি দীর্ঘ গবেষণা ও পরামর্শের ভিত্তিতে তা করে থাকে।

এ ছাড়া নেসাব কমিটি তাদের গবেষণার ভিত্তিতে মাদরাসার ছাত্রদের জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যুগোপযোগী একটি আধুনিক শিক্ষার নেসাব প্রণয়ন করে এবং নেসাবটি বাস্তবায়িতও হয়েছে। নেসাবের বইগুলো সৃজনশীল ও যুগোপযোগী করে তানযীম প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমি নেসাব কমিটির কাছে জোরালো আবেদন করব, আকাবিরদের রেখে যাওয়া নেসাবের কদিম কিতাবগুলো পুনঃসংযোজনে গবেষণাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হবেন।

তানযীমের কর্মতৎপরতা

আল হামদুলিল্লাহ, তানযীমের বছরব্যাপী কর্মতৎপরতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতি আপনাদের সকলের সামনেই রয়েছে। তদুপরি বিশেষ কিছু তথ্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

তানযীমভুক্ত মাদরাসার সংখ্যা ১৫৬৩। গত সালানা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ৩৭ জন।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তানযীমভুক্ত মাদরাসাগুলোর নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি জেলায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। দায়িত্বশীলগণ মাদরাসাগুলোর যেকোনো সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তানযীমভুক্ত মাদরাসাগুলোর হেফজ বিভাগের মানোন্নয়নে ইতিমধ্যে ১০ দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তানযীমের কেন্দ্রীয় কার্যালয় নির্মাণের জন্য জামীল মাদরাসা কর্তৃক অনুদান হিসেবে প্রদত্ত জায়গায় তানযীমের নিজস্ব অর্থায়নে বহুতলবিশিষ্ট তানযীম ভবনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। তৃতীয় তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চতুর্থ তলার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে দ্রুততম সময়ে ইনশাআল্লাহ নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে আশা করছি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তানযীমভুক্ত মাদরাসাসমূহের সময়োপযোগী মানোন্নয়নে সর্বোত্তম পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণে তানযীম বদ্ধপরিকর। এর জন্য তানযীমের রয়েছে বেশ কিছু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। উল্লেখযোগ্য কিছু পরিকল্পনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

২। আলেম-উলামা ও ছাত্রদেরকে সব ধরনের বাতিলের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে পারদর্শী করে তুলতে ব্যাপক আকারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। তানযীমের ফুজালাদের দস্তারে ফজীলত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে এখনো কোনো মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে কোরআন ও বুনিয়াদী ইসলামী শিক্ষার জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা।

৪। প্রতিটি থানায় বয়স্কদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

৫। আলেম-উলামা ও মাদরাসার ছাত্রদের ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানবিক সহযোগিতার জন্য ব্যাপকভিত্তিক একটি চিকিৎসা ফান্ড গঠন।

৬। তানযীমের প্রকাশনা বিভাগের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি অফসেট প্রেস স্থাপন করা।

৭। মাদরাসার ছাত্রদেরকে হস্তশিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য একটি আধুনিক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

তানযীমের এই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। আমি আশা করছি, এই প্রকল্পগুলোসহ তানযীমের যাবতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয়

বর্তমান সময়টি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুবই ভয়াবহ ও নাজুক হয়ে উঠছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে হিংসা, বিদ্বেষ, দলাদলি, মারামারি, হানাহানি। মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সব ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ। এমনই একটি সময়ে উলামায়ে কেরামের করণীয় কী হওয়া দরকার? এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর হলো, প্রথমে নিজেকে নববী আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হবে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করতে হবে। খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের সুহবত গ্রহণের মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি কোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ গভীরভাবে অনুধাবনকরতঃ সে মোতাবেক আমলের সচেষ্ট হতে হবে।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।' (সূরা মুযযাম্মিল ৮)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়ক রূপে।' (সূরা মুযযাম্মিল ৯)

এই দুটি আয়াতে মৌলিকভাবে তিনটি বিধান বিবৃত হয়েছে। উপস্থিত সকলে উলামায়ে কেরাম। তাই আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাব না।

ক. সদাসর্বদা একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা।

খ. দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছু অন্তর থেকে বের করে আল্লাহর মোহাব্বতে অন্তরকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করা।

গ. সব কাজের মধ্যে আল্লাহর ওপর অটল আস্থা ও পরিপূর্ণ ভরসা রাখা।

উল্লিখিত আহকামগুলোর ওপর আমল করতে হলে আমাদের মাদরাসাসমূহের সার্বিক পরিবেশ *درمدرسہ خانقاہ بود* এর সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন আমাদের আকাবিরগণ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৭-২১

তারিখসমূহ

১৬-১৭	ফেব্রুয়ারি	২০১৭
১৫-১৬	ফেব্রুয়ারি	২০১৮
১৪-১৫	ফেব্রুয়ারি	২০১৯
১৩-১৪	ফেব্রুয়ারি	২০২০
১১-১২	ফেব্রুয়ারি	২০২১

রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার

প্রচারে : ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ

আগামী ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১৭ ইং

রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার

বন্দরনগরী চট্টগ্রামস্থ

জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহরের

বার্ষিক সভা

অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ

প্রচারে : জামিয়া কর্তৃপক্ষ

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪